আজ এবং আগামী কাল

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

এম্‌, সি, সরকার এণ্ড সন্স
১৫ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৩৬

লেখকের কবিতা-সংগ্রহ
'মানুষ'
ও
'চুম্বন'
কাব্যজগতে নূতন সুর

কুন্তলীন প্রেস
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রিণ্টার—শ্রীচন্দ্রমাধব বিশ্বাস

দাম দেড় টাকা

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু

শ্রদ্ধাভাজনেষু

গত দু' বছরে যে প্রবন্ধগুলি আমি লিখেচি তার অধিকাংশই আত্মশক্তি ও নবশক্তি কাগজে প্রকাশিত হয়েচে, কেবল 'আধুনিক নাটক' সম্বন্ধে রচনাটি নাচঘরে বাহির হয়।

সাহিত্য-নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিমত তাঁর কাগজে প্রকাশের যে সুযোগ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় আমাকে দিয়েচেন তার জন্য তাঁর কাছে আমি বিশেষ ঋণী; এই সুযোগে তাঁকে এবং নাচঘর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার এই বইখানির বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য-বিধানে শিল্পী শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের হাতের ছাপ আছে; তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

শিবরাম

১৩৪, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মহালয়া, আশ্বিন ১৩৩৬

সূচী

আজ এবং আগামী কাল

সাহিত্যে

শিল্প মাত্রই মানুষের মনের রূপ—যখন তা পাথরে মূর্ত্তি ধরে বলি ভাস্কর্য্য, রংয়ে-রেখায় মূর্ত্ত হ'লে বলি চিত্র। এই মনের রূপ তখনই সাহিত্য হ'য়ে ওঠে যখন তা রূপবান ভাষার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই সাহিত্য-রচনা যখন আমার মনের মত হোলো এবং আমার পাঠকের মনে লাগ্‌লো তখনি তা সার্থক; তখনি অনন্তের কাছে আমার দেনা চুক্‌লো, নিজের পাওনা পেয়ে গেলুম তখনি আমি কৃতার্থ। বিশিষ্ট মন ও বড়ো মন যে সাহিত্য-রচনায় যত অপরূপ হ'য়ে দেখা দিয়েচে তাকেই বল্‌ব তত-বড়ো সৃষ্টি।

মনের রূপ নানা আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের ভেতর দিয়ে যুগে যুগে বিচিত্র হ'য়ে ওঠে—কিন্তু দেহরূপের একটা চিরন্তন আদর্শ আছে। মনের কোনো সীমা-রেখা নেই, দেহের আছে। এইজন্য সাহিত্য কী বলে, তার যুগে যুগে বদল হয়েচে, কিন্তু কী-রূপে বলে তার আদর্শ বিশেষ বদলায়নি; কেননা সাহিত্যের বিচারে বস্তুর চেয়ে তার রূপ বড়ো।

এই জন্য আর্টিষ্টকে ভাষারও রূপ সাধনা করতে হবে—বিরূপ ভাষা রসগ্রাহী চিত্তকেও বিমুখ করে' তোলে। কোনো একটি বিশেষ ষ্টাইল্ তিনি মানবেন এমন কথা নেই; দুটি দেহরূপের প্রকাশ একরূপ নয়, তবু নিখিল দেহরূপের মধ্যে একটা আদর্শের মিল আছে। সেইরকম ভাষারও।

কেবল কবিতায় নয়, গদ্য রচনারও ছন্দ আছে—কেবল আর্টিষ্টের কানেই তা ধরা পড়ে। গতিয়ের (Gautier) বহুদিন আগে বলেছিলেন, একটি ভাব প্রকাশের জন্য একটিমাত্র কথা আছে। সেই কথাটি খুঁজে যথাস্থানে বসাতে যিনি পারেন তিনিই কথা-শিল্পী। কেবল ভাবের নয়, কথার সাধনাও এইভাবে করতে হবে—যিনি তা করতে রাজি নন্ সাহিত্য-রাজ্যে তাঁর গতি বেশি দূর নয়, এবং দুর্গতি আসন্ন।

যার থেকে একটিমাত্র শব্দ তুলে নিলে কেবল ভাষার নয়, ভাবেরও অঙ্গহানি ঘটে, তাকেই বল্‌ব নিখুঁত রচনা। যেমন নিখুঁত ছবি—যতগুলি রেখায় তা সম্পূর্ণ কেবল ততগুলি রেখাতেই সম্পূর্ণ—আর একটি বেশি রেখাও তাতে অচল। এই জন্যই, লেখার চেয়ে না লেখা বেশি শক্ত। অল্প কথায় যিনি বেশি কথা বলেন তিনিই সত্যিকারের গুণী। প্রত্যেকটি শব্দের জন্য একটি করে' মোহরের বরাদ্দ থাক্‌লেও, যিনি প্রয়োজনের বেশি একটি শব্দও যোগ করেন না, তিনিই শব্দযোগী; তাঁর সাহিত্য-তপস্যা সিদ্ধ হবেই।

আজ এবং আগামী কাল

সাহিত্যিক-ধর্ম্ম

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যধর্ম্ম' বলে' একটি প্রবন্ধ লিখেচেন, একদল লোক তাতে সায় দিয়ে বলচেন, আমাদেরও ঐ কথা! অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের যা সাহিত্যিক ধর্ম্ম, তাঁদেরও তাই।

ভক্তির উচ্ছ্বাস জিনিষটে হয়তো ভালোই, কিন্তু উচ্ছ্বাস যখন অত্যাচার হ'য়ে দাঁড়ায় তখনই বিপাক! তাঁরা অন্যদলকে লক্ষ্য করে' বলচেন, তোমাদেরও কেন এই ধর্ম্মই নয়? এ যদি না মানো তোমরা নাস্তিক,—যদি নিতান্তই দীক্ষা না দিতে পারি শিক্ষা দিতে ছাড়চিনে।

অপর পক্ষ নীরব। সাহিত্য-বস্তু যে কী তা তর্ক করে' বোঝানো যায় না, সৃষ্টি করে' বোঝাতে হয়। এবং সেজন্য কোলাহল থেকে সতর্ক থাকতেই হয়।

কাকের দল যদি একদিন ঘোষণা করে' বসে যে, ময়ূরের ধর্ম্মই আমার, তাতে তার স্বরূপ বদ্‌লায় না, এমন কি ময়ূরপুচ্ছের কোটেশনে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকলেও।

বুদ্ধ ও খৃষ্টের জন্মের পর কোটি কোটি লোক বুদ্ধ ও খৃষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করে' দেহত্যাগ করেচে কিন্তু কেউ দ্বিতীয় বুদ্ধ বা খৃষ্ট হ'তে পারেনি। তাদের দুর্ভাগ্য: কিন্তু হ'তে পারলেও দুর্ভাগ্য কিছুমাত্র কম হত না।

রবীন্দ্রনাথের যা সাহিত্যিক-ধর্ম্ম তা ন্যুট্‌-হাম্‌সুন্‌ বা বার্ণার্ড শ'র সাহিত্যিক ধর্ম্ম নয়, কিন্তু সেটা তাঁদের অগৌরবের কথা কেউ বলে না। আধুনিক সাহিত্যিকেরা যদি রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো সাহিত্যরথীর ধর্ম্মের ফতোয়া না মেনে নিজেদের অন্তরের প্রেরণাকেই আশ্রয় করে' চলেন তাতে অন্যায় কিছু দেখিনে। স্বাধীনতা সর্ব্বত্রই চাই, এমন কি সাহিত্যেও।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম্ম পেয়ে গেছেন, তিনি চরিতার্থ,—তরুণ পথযাত্রীরা এখনও খুঁজ্‌চে। তারা কী পাবে সেটা সম্ভাবনার গর্ভে; একজন যা পেয়েছেন তার মানদণ্ডে তাকে মাপা যায় না, জানাও যায় না।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম্ম'—তা রবীন্দ্রনাথেরই সাহিত্য-ধর্ম্ম, তাঁর একান্ত নিজস্ব,—তার প্রতিবাদ করার কিছু নেই; কিন্তু তাই বলে' আর সবার রচনা যদি তাঁরই অনুবাদ হ'য়ে দাঁড়ায় তাকে আত্মহত্যাই বলতে হবে।

মহাপুরুষের ধর্ম্ম মেনে গোঁজামিল দিয়ে চলার দিন আর নেই,—যত মানুষ তত ধর্ম্ম—এ যুগে এই সত্য লোকে জেনেচে। সেই স্ব-ধর্ম্মের মধ্যে জাগা এবং জাগানোই আধুনিক সাহিত্যের ইঙ্গিত।

সাহিত্যের ধর্ম্ম নিয়ে এত কালি গড়ালো যে সাহিত্যের মর্ম্ম বলে' আরো একটা-কিছু আছে সেটা পড়ে গেল আড়ালে।...

মনের রূপই হচ্চে সাহিত্য।

সাহিত্য এমন অভিনব রূপ কেন নিলে তার

জবাব এই যে, আজকের জগৎ, আজকের জীবন, আজকের মন বিচিত্র হ'য়ে উঠেচে।

এই মুক্তধারার স্রোত অনাগত কালে বেড়েই চলবে—আরো উদ্দাম, আরো বিস্তৃত হ'য়ে। কোনো ভগীরথেরই সাধ্য নেই, এই ভাগিরথীকে বাঁধা-ধরা পথে চালায়, তাতে মৃত মহাত্মাদের যদি সদ্গতি না হয় নাই হোলো—জীবন্ত নর-নারীরা অবগাহন করে' বাঁচবে ত।

এই সাহিত্যের স্রোত যদি মানুষের বাড়ী ঘর, বাধা বন্ধন, সমাজ ও সংস্কার ভাসিয়েও নিয়ে যায় তবু আমরা কোনো জহ্নু মুনির কাছে গিয়ে বলতে চাইনে, প্রভু, একে হজম করে' ফ্যালো। নতুন সৃষ্টির উপকূল যে এরই মোহানায় রচিত হবে, নতুন মানুষের ঘর বাঁধার জন্য।

অভিজাত সাহিত্যিকদের বনেদী সাহিত্য বহুকাল ধরে' বহু মানুষের কানে কথা বলেচে, সত্য কথা। কিন্তু আজো যদি তারাই কথা বলতে থাকে তবে আমরা আজকের-মানুষের কাছে আপনার সুরে যে-কথাটি বলতে চাই তা বলতে পাব না এবং বললেও তারা শুনতে পাবে না।

যাঁরা মরেচেন তাঁদের কবরেই যদি পৃথিবী

ছেয়ে রইল তবে যারা বেঁচে আছে তাদের গতি কোথায়, পথ কই ?

শোনবার লোকের কানটাকেই কেবল বড়ো করলে চলবে না—মহামহা রথীরা বারবার মলে' মলে' সে দুশ্চেষ্টা আগে করে' গেছেন;—আজকের যুগের লেখক তার প্রাণটাকেই বড়ো করতে চায়—সম্ভবত সেটা গলে'-গলে'ই হবে। কেবল তার আসনটাই তো নয়, তার জীবন তার জগৎ-কেও বড়ো করবার বিশ্বজোড়া সাহিত্য-ব্রতের অংশ নিয়েচে আজকের কবি আজকের কথা-সাহিত্যিক। তাদের রচনার ধারাটা হয়তো নিজস্ব—তার মধ্যে সার্ব্বজনীন আদর্শের ঘোষণা হয়তো নেই কিন্তু সার্ব্বজনীন দর্শনটা তো প্রত্যক্ষ।

সাহিত্যের চরম উন্নতির যুগ চলে গেছে, তার কীর্ত্তি মহাকাব্য, মহানাটক, মহা উপন্যাস আজো হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে,—তারই গোমুখী থেকে নেমে এসেচে আজকের পরম গতির যুগ—যার পাকে পাকে নতুন স্রোত, বাঁকে বাঁকেই চমক্‌ !—কিন্তু এ-ই যে নিয়তি।

কবি বলচেন—তুচ্ছ ও মহতের, কাঁকর ও

পদ্মের ভেদ অসীমের মধ্যে না থাকুক, সাহিত্যের মধ্যে থাকা উচিত।

কিন্তু কেন ?

তুচ্ছ ও মহতের, কাঁকর ও পদ্মের ভেদ ব্যবহারিক জীবনে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করে' চলিনে, চলতে পারিনে,—কিন্তু সাহিত্য তো জমাখরচের খাতা নয়, সেখানে কড়াক্রান্তির হিসাবের বাইরে গিয়ে হাঁপ ছাড়ার মুক্তি যদি সাহিত্যিকের না থাকে তবে থাকবে কোথায় ?

সৃষ্টির আলোয় অনেক সময়ে তুচ্ছকে মহতের চেয়ে উচ্চ দেখি, বেশি ভালো লাগে বেশি ভালোবাসি তাকে। পদ্ম মর্ম্মের আনন্দের মধ্যেই ফোটে, কিন্তু কাঁকরও মর্ম্মান্তিক সীমার গভীরতর চেতনায় নিবিড়তম ব্যথার মতোই ফুটতে পারে, তাই কি মিথ্যে, তার দামই কি কম ?

কথা উঠেচে আধুনিক সাহিত্য বনেদী নয়, নিত্যকালের বস্তু নয়—এর আয়ু অত্যল্প।

মহাকালের স্রোতে কোন সাহিত্যই টিকচে বা টিকবে ? এবং কার তুলনায় কার আয়ুকেই বেশি বলা চলে ?

দেহের রূপও অপূর্ব্ব, কিন্তু তাও নিত্যকালের নয়,—কিন্তু নিত্যকালই নব নব দেহে এই মহা বিস্ময়ের আত্মপ্রকাশের আর বিরাম নেই।

মনের রূপও যদি নিত্যকালের না হয় তাতেই দুঃখ কি? সৌন্দর্য্যের মতো সাহিত্যও যদি সমসাময়িক লোকের মনোরঞ্জন করে' থাকে, প্রেরণা দিয়ে থাকে, তবে তো সে তার পাওনা পেয়ে গেচে।

আমরা যে-পথ কাটচি তা আমাদেরই চলবার জন্যে, আজকের মানুষের জন্যে; প্রাচীনেরা তাঁদের অচল আসনে বসে' থাকুন আমরা ডাকচিনে তো,—অনাগত কালের যাত্রীদের আমাদের কাটা পথেই চলতে হবে এমন দুর্ভাবনা বা দুস্পর্দ্ধাও আমাদের নেই—তাদের আত্ম-প্রকাশের পথ তারা দেখে নেবে।

এ সব অতি সত্য কথা; এ নিয়ে বিবাদ চলেনা। কিন্তু তবু চলে। আধুনিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করে' অর্দ্ধরথীদের তূণে যত গাল আর ঝাল ছিল ফুরিয়েও আর ফুরোয় না। প্রীতিবাদ যেখানে নেই প্রতিবাদ সেখানে উগ্র।

মনে ভাবি এই বুঝি আমাদের অভ্যর্থনার নিয়ম, গান করে' নয়, বাণ মেরে।—বেশ!

মাইকেল যখন অমিত্রাক্ষর চালান তখন অক্ষর ছাড়াও অনেক অমিত্র তাঁকে সইতে হয়েচে, বঙ্কিমের ওপরেও আঘাত কম হয়নি, কিন্তু তিনি তাতে ভাঙেনও নি, বেঁকেনও নি। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রও এই সনাতন প্রশস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েচেন বলা চলে না। এবার অতি আধুনিকদের পালা। সাহিত্যে 'নবত্ব' যাঁরা আনতে চাচ্চেন তাঁদের যে শক্তি আছে এই যুদ্ধঘোষণাতেই তার পরিচয়। ফলাফল সম্বন্ধে আশঙ্কা নেই, কেন না এটা সন্ধি করারই অভিসন্ধি, রফা করার প্রথম দফা।

সাহিত্যে অভিনবত্ব

নিরাকার স্রষ্টা যখন বলেন, এক-আমি বহু হব, তখন তিনি সেই বহুর মধ্যে দেন বহু বৈচিত্র্য ; তাদের ভিতরে যোগসূত্র যে থাকে না এমন নয়, কিন্তু সেই একত্বকে তিনি এমনভাবে গোপন করেন যে তাদের অনৈক্যটাই বড়ো হ'য়ে দেখা দেয়।

বড়ো বড়ো ঋষিরা ঘোষণা করেন তিনি সত্য-শিব-সুন্দর ও স্বপ্রকাশ,—কিন্তু মানুষের ভিতরে যখন তিনি মূর্ত্ত হন, তখন মহর্ষিদের কথামতো আত্ম-মাহাত্ম্য জাহির করবার তাঁর কিছুমাত্র ব্যস্ততা দেখা যায় না। যে-দেহে তিনি বাস করেন সেখানে তাঁরই কর্ত্তৃত্ব করার কথা, কিন্তু তিনি এমনি নেপথ্যে আত্মগোপন করে' থাকেন যে মনে হয় দেহ আর মনই যেন সর্ব্বেসর্ব্বা। কেবল তাই নয়, মনের প্রত্যেকটি বৃত্তি, দেহের

প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে তিনি দেন স্বতন্ত্র স্বাচ্ছন্দ্য, পরস্পর নিরপেক্ষ স্বাধীনতা।

—এইটেই আশ্চর্য্য!

কিন্তু সাকার স্রষ্টাও যখন ঐ কথা বলে' বসেন তখনই হ'য়ে ওঠে ত্রাসের। তাঁর বহু হওয়ার মানে বহু-এককে তাঁর নিজের অনুরূপ করা,—তিনি চান চারদিকে তাঁরই বহু বহু সস্তা সংস্করণ কেউ যদি কোনোক্রমে আট-আনা-সংস্করণ অবধি পৌঁছে—তিনি দুঃখিত না হ'য়ে গর্ব্বিতই হন, কিন্তু সংস্করণ-বেচারীর ষোলো-আনাই মিথ্যে হ'য়ে যায়।

বিধাতা যখন বহুর সঙ্গে এক হন তখন আপনাকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেন, পরস্পর-বিরোধী রূপে দেখা দেন। কিন্তু মানুষের বেলা বহুর সঙ্গে এক হওয়ার মানে, বহুকে গ্রাস করে' আত্মসাৎ করে' নিজের সঙ্গে এক করা। এ-কে বলা যেতে পারে একের সাম্রাজ্যবাদ। বিধাতার সৃজনে এই আশ্চর্য্য বস্তুটি নেই, মানুষের সৃষ্টিতে আছে।

নিরাকার স্রষ্টার সব কিছু ব্যাপারই নিতান্ত সেকেলে, কিন্তু সাকার স্রষ্টার রাজ্যেই অভিনবের

নব নব পরিচয়! এখানে অভিনব তর্ক ওঠে, অভিনব দাবী দাঁড়ায়, অভিনব মর্ম্মকথা ব্যক্ত হয় অভিনব সাহিত্যে;—বিধাতার ভূগোলে অপূর্ব্ব কিছু ঘটে না, মানুষের ইতিহাসেই প্রতিপদে তার সাক্ষাৎ পাই।

কবির মুখে অভিনব কথা শুনি, তিনি বলেন, আমি যে-পথ সৃষ্টি করেচি এই-ই একমাত্র পথ। তোমরা এই-পথে চলবার যোগ্য হও, নতুবা পথ ছাড়ব না।

কেউ যদি বলে, নাই চল্‌লাম ও-পথে, নিজের পথ নিজেই দেখে নেব। প্রত্যেক মানুষের যখন স্বতন্ত্র পা তখন তার গতিও স্বতন্ত্র হবার কথা।

কবি তখন বলেন—আমার অনুসরণ যখন করচো না, ওটা তোমার উন্মার্গ-যাত্রা। সে-কথা আমিই বলচি।

সকলের জন্য যে-পথ সে রাজপথ। কেবল একজনেরই পদ-চিহ্ন যে-পথে তাই সাহিত্য। সকলের পথে যে চল্‌ল না, একাই চল্‌লো—তার উন্মার্গ যাত্রা সন্দেহ নেই; কিন্তু সে যে ভুল চলেচে, লক্ষ্যে পৌঁছবে না, আজ যাত্রার গোড়াতেই কে তা বলবে?

পৃথিবীর আদি-পথিকরা উন্মার্গ পথেই চলেছিল, তাদের পদচ্যুত হয়েই রাজপথ জন্মালো। নতুন পথ-রচনার প্রয়োজন আজো নিঃশেষ হয়নি।

কিন্তু সাহিত্যের যদি বাঁধানো রাজপথই হোতো তাহলেও পথরোধের কথা ওঠে না। একান্তভাবে অধিকার করে' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাস করতে যে-কোনো পথ একজনের পক্ষেই অপ্রশস্ত কিন্তু সেই পথই আবার লক্ষ লক্ষ লোকের চলার পক্ষে যথেষ্ট। পথে নেমে পথ অধিকারের কোনো অর্থই নেই, কেউ আগে আগে যেতে পারেন, কিন্তু সে তাঁকে স্থান ছেড়ে ছেড়েই যেতে হবে। পথ অধিকারের মানসে যদি তিনি স্থান না ছেড়ে স্থানু হ'তে চান, তাঁকে সমস্ত পথটাই ছাড়তে হয়। কেবল গতি রুদ্ধ করলেই পথ রুদ্ধ হ'তে পারে।

কিন্তু সমস্যাটা তো পথের নয়, সমস্যাটা হচ্ছে সাম্রাজ্যের। আগেই চলুন আর পিছনেই চলুন পথিকে-পথিকে যে সম্বন্ধ তা' শুধু পথের। কিন্তু এখানে হচ্ছে সম্রাট ও প্রজার সম্পর্ক। পথিকের স্বাধীনতা আছে, প্রজার নেই—প্রজার পক্ষে তা

বিদ্রোহ। তার দস্তুরমতো শাসনের দরকার, তার কাছে খাজনা আদায় চাই-তার জন্যে সাহিত্য-সম্রাটের তরফ থেকে সাহিত্যিক গোমস্তা নিযুক্ত করতে হয়। তাদের খুসি রাখতে মাঝে মাঝে পিঠ চাপ্‌ড়ে বলতে হয়, বাঃ বাঃ, তোমাদের এই গোমস্তিক শাসন-প্রণালী চিরন্তন আর্টে গিয়ে দাঁড়িয়েচে।

তা দাঁড়িয়েচে সত্যি। সাহিত্যিক, জমিদারি, কিম্বা সরকারী—যে-গোমস্তাই হোক্ না কেন, তাদের শাসন-প্রণালী যে চিরন্তন আর্টের কোঠায় পৌঁছেচে ইতিহাস তার সাক্ষী। যুগে যুগে সাহিত্য, শিল্প ও রাষ্ট্রতন্ত্রের ধরণ বদলেছে, কিন্তু গোমস্তাগিরির ধরণ সেই কোন যুগে যা ছিল আজো তাই; পৃথিবীতে অচল অনড় সার-সত্য যদি কিছু থাকে তো এই। কর্ত্তাভজানো এদের কাজ—গাঁয়ে এদের মানেনি বটে, কিন্তু কর্ত্তার পায়ে এরা বর্ত্তে গেছে।

সাহিত্যিক গোমস্তাদের রাগের কারণ বুঝি। 'একদা পুলকে প্রভাত আলোকে যখন পাখী গাহিছে' তখন কাঁটা তার চিরন্তন সত্যের তীক্ষ্ণতায় অনিত্য ফুলকে যে-কারণে উপহাস

করেছিল তার সঙ্গে এদের মর্ম্মকথা মর্ম্মান্তিক মিলে যায়। কর্ত্তার ও কর্ত্তৃত্বের পক্ষে এদের কচায়ন পাহাড়ের মতো উঁচু হোলো, কিন্তু নদীর স্বচ্ছন্দ-গতি ও সুদূর-বিস্তারী সৃজন-রহস্যের কাছে এই সুতীক্ষ্ণ স্তূপ যে একান্তই ব্যর্থ—এই নিষ্ঠুর সত্যের সঙ্গে তাদের প্রতিনিয়তই চোখাচোখি ঘটছে। সেটা তারা বুঝচে, এবং বুঝচে বলে'ই কোনোমতে মানতে পারচে না।

—কিন্তু সত্য-সন্ধানী কবির বিরাগের কারণ বুঝিনে। যিনি একদা বলেছিলেন, 'সত্য যেথা বিন্দু আছে বিশ্ব সেথা রয়'—তাঁকে আজ বিশ্ব-বহির্ভূত আশ্রয় নিতে দেখলে ব্যথা জাগে।

বোধ করি এমনিই হয়। যে-বস্তু হৃদয়ের যত নিকটের তাকেই মানুষ তত দূরে সরিয়ে রাখে, যে-আত্মীয় তাকেই আঘাত করে,—ব্যর্থ করতে চায়। যে-আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার সাধনা ও বেদনা জীবন ভরে' ছিল অনেক সময়ে তাকে পরাজিত করে'ই তার আনন্দ। আত্মার চেয়ে প্রিয় তো কিছু নেই, অথচ আত্মহত্যা করবার দুষ্ট-ইচ্ছা মানুষের মনেই আছে।

স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার কামনাই তো গান্ধিজীর

বিরাট আন্দোলনের মূলে ছিল, অথচ বার্দ্দোলিতে সেই স্বাধীনতাকেই তিনি পায়ে ঠেলে পিছিয়ে দিলেন,—যাদের মুক্তি আনতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন সেই ত্রিশকোটি নর-নারীর পলিটি-ক্যাল হত্যা সমাধা করে' নিশ্চিন্ত হলেন। নিজের উদ্দেশ্যকে পরাজিত করলেন, অথচ আশ্চর্য্য এই যে, কিছুমাত্র অনুতাপ নেই।

যে-দিনটির স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথের হয়তো ছিল, অবশেষে সেই-দিনটি যখন এল, লাঞ্ছনা দিয়েই তিনি বরণ করলেন তাকে। বঙ্গ-সাহিত্যের বন্ত-বৃদ্ধির ধ্বংস-কামনায় আজ ব্যঙ্গ-সাহিত্যও তাঁর কাছে প্রিয় হ'য়ে উঠেচে—যে ব্যঙ্গ-সাহিত্য কোনো দৈনিক রঙ্গ-সাহিত্যেরই অক্ষম অনুকরণে এই কিছুদিনমাত্র বহিষ্কৃত হোলো। যদিও কবির প্রশংসাপত্রে ব্যঙ্গ-সাহিত্যিকরা লেখক হিসেবে 'বাভাবীর' পর্য্যায়ে পড়েচেন, তবু তাঁরা যে রঙ্গ-সাহিত্যিক 'কাগজী লেখকদেরই' সগোত্র তাতে আর ভুল নেই, প্রচুর অম্লরসেই সেটা ধরা পড়ে।

কিন্তু দুঃখ সেজন্য নয়, দুঃখ এই যে, ব্যক্তি-কুৎসার ভিতরেও কবি আর্ট পেলেন, অথচ

নব-সাহিত্য-সম্ভারের কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু দেখলেন না। তিনি ভুলে যাচ্চেন যখন তিনি আধুনিককে আঘাত করচেন তখনই তার ভাবী সম্ভাবনা, অ-দৃষ্ট ভবিষ্যতও আহত হচ্চে।

সাহিত্যে গণতন্ত্র হয়তো তাঁর কামনা নয়, কিন্তু আধুনিক ইতিহাস যে সর্ব্ববিধ সাম্রাজ্যেরই পূর্ণচ্ছেদ ঘোষণা করচে—ব্যক্তি-প্রাধান্য বাস্তব জগতেই লোপ পেতে বসলো, শিল্পজগতে তার অস্তিত্ব তো আরো বেশি অসত্য। নেপোলিয়ন যখন একজনই জন্মায়, তখন তাকে মেনে কোনো-মতে কাল কাটে; কিন্তু মানবজাতির ভাগ্যক্রমে যদি কোনোদিন জনে জনে নেপোলিয়ান হ'য়ে ওঠে তখন ব্যবস্থাটা আপনিই বদলায়। বাংলা-সাহিত্য যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো একছত্র সম্রাট পেয়েছিল এ তার একান্ত গর্ব্বের, কিন্তু আজ তার বুকে যে বহুছত্র গণতন্ত্রের সূচনা হয়েচে তার সে-গৌরবও তো কম নয়।

একছত্র সাম্রাজ্যের সবই ভালো, কেবল অকল্যাণ এই যে এক বনস্পতির আওতায় এমন অনেক অঙ্কুর বাড়তে পায়না যাদের বীজে বনস্পতিত্বেরই সম্ভাবনা ছিল। একজনের

রক্ষণাবেক্ষণে সাহিত্য-ধর্ম্ম সুনির্দ্দিষ্টরূপে বজায় থাকে সন্দেহ নেই, কিন্তু বহু সাহিত্যিক-ধর্ম্ম নিষ্ফল হয়। গতযুগে সৌর-সাম্রাজ্যের বহু গ্রহ উপগ্রহই রবির অকৃপণ আলোক-ঋণ পেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের দুএকজন মাত্র আজো ঝিক্‌মিক্ করচেন; অধিকাংশের আঁধারে ঘুরে মরাই সার!—এক শরৎচন্দ্রই গোত্র ছাড়া, কেবল তিনিই সেই ঋণ শোধ করতে পেরেছেন।

(এখানে উল্লেখ থাকা ভালো, শরৎচন্দ্র ইতিমধ্যে আপনাকে ছোটো-সম্রাট নামে ঘোষণা করেচেন। যদিও তাঁর গ্রহ-উপগ্রহ বা চান্দ্র জগৎ বলে' কিছু নেই, তবু সাম্রাজ্যবাদের এমনি মোহ! রবির আলো-কেই চন্দ্র যদি কোমল, করুণ ও স্নিগ্ধ করে' ফিরিয়ে দিতে পেরে থাকেন তাঁর লজ্জার কিছু নেই, কিন্তু এই সুযোগ বা দুর্য্যোগে যদি তিনিও রবির দিকে পিছু ফেরান তাতে তাঁর কলঙ্ক ঢাকে হয়ত, কিন্তু আলোও যে ঢাকা পড়ে!)

এইবার সাহিত্যের রাজতন্ত্র থেকে সাধারণ তন্ত্রে আসা যাক্। কিন্তু এখানে এসেও নিস্তার নেই, ইম্পিরিয়ালিজম যদি বা ছাড়ে, ক্যাপিটালি-

জন্মের কবল থেকে মুক্তি মেলে না। যে সব কবি ও শিল্পী দৈবক্রমে আগে জন্মে গেচেন তাঁদের মূলধনের ঋণ স্বীকার না করে' চলে না— এবং এমনি করে' সঞ্চয়ের বোঝা পরবর্ত্তীদের ঘাড়ে উত্তরোত্তর ভারি হ'য়েই বাড়ে।

তর্ক উঠেচে প্রবীণের কাছে নবীন ঋণী কি না, এবং কতটা ঋণী? ঋণের দাবীটা এমন জটিল এবং এত পাকচক্রে বেড়ে ওঠে যে কোনো চক্রান্তেই একে এড়ানো যায় না। হিসেবের খাতা খুলে বসলে এপ্‌ম্যান্ কেভ্-ম্যান্ থেকে লংম্যান-হুইট্‌ম্যান্ পর্য্যন্ত সবার কাছেই ঋণ ধরা পড়ে যায়। এপ্‌ম্যান্ কেভ্‌ম্যান্ অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিশিয়ে আছে, লংম্যান্ ও হুইট্‌ম্যান্ স্মৃতি ও মর্ম্মকোষে জড়িয়ে গেছে। অথচ এসব ঋণের কথা আমাদের মনে নেই; এবং মনে নেই বলে'ই মর্ম্মান্তিক সীমায় এদের ডিক্রি জারি হ'তে থাকে।

আগে যাঁরা কাব্য ও শিল্প রচনা করে' গেছেন তাঁদের অভাবে আমাদের সৃজনশক্তি ব্যর্থ হোতো একথা আমরা মানিনে। তাঁরা আগে জন্মেচেন বা তাঁদের সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেচে,

এটা একান্তই দৈব ঘটনা। কবি বলচেন, বাল্মিকী প্রভৃতি কবিরা আগে এসেছিলেন বলে'ই তাঁর আসা সম্ভব হয়েচে। কিন্তু তবু এই প্রশ্নটা থেকে যায়, বাল্মিকী সম্ভব হলেন কিসে? ছেলে হাঁটতে শেখে মার কাছে—কিন্তু হাঁটে সে নিজের জোরে। বরং একথা বল্লে কিছু সত্য শোনায় যে যে-অনন্তের রহস্য-খনি থেকে আদিম-মানব চলবার শক্তি ও প্রেরণা পেয়েচে, আজকের মানুষও সেখান থেকেই তার পাওনা পাচ্চে।

অতীতের গর্ভ থেকে আমরা এসেচি এটা বর্ত্তমানেরই সত্য, একথা অস্বীকার করিনে। কিন্তু মায়ের গর্ভ থেকে এসেচে—একমাত্র এই তথ্যের জোরে মা-ই যদি চিরকাল চালাতে চান তাহলে ছেলেকে নিজের কাছে অচল থাকতে হয়। অতীত মানুষের অবচেতনায় থাকে, সেই তার যথার্থ স্থান, সেখান থেকে অগোচরে ও অনায়াসে সে সত্যের নির্দ্দেশ দেয়; কিন্তু চেতনাকে আচ্ছন্ন করলেই সে আনে বিপাক। অতীত ব্যক্তির মধ্যে থাকুক, কিন্তু ব্যক্তি অতীতের মধ্যে থাকলেই ঘটে বিগতি।

কিন্তু অতীতের তর্ক এখানেই থামে না,

লেখককে ছেড়ে অবশেষে পাঠককে ধরে। কিছু দিন আগে কোনো পণ্ডিত গবেষণা করেছিলেন যে ইউরোপের পৌরাণিক সাহিত্য না পড়লে আধুনিক সাহিত্য বোঝবার অধিকার জন্মায় না। শনিচক্রও বারবার বহু 'কোটেশনে' এই-তত্ত্ব প্রচারই জীবনের সত্য করেচেন। পাণ্ডিত্যের অমর্য্যাদা করিনে, কিন্তু পাণ্ডিত্য যদি রচনা গায়ে চাকা চাকা হ'য়ে ফুটে ওঠে তবে তা এখনও কাঁচা বলতে হবে।

কিন্তু কথা দাঁড়ায় এই, রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে ঈশ্বর গুপ্তকে লুপ্ত পুঁথি থেকে উদ্ধার করতে হবে, এবং তাঁকে বুঝতে হ'লে কাশীরাম দাসের দ্বারস্থ হ'তে হবে,—এমনি করে' চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব এঁদের কাউকে বুঝতে হ'লে তাঁর অগ্রবর্ত্তীর পশ্চাদ্ধাবন ছাড়া গতি নেই; হয়তো কালিদাসকে বোঝার অধিকার লাভ করতে অশোকের শিলালিপিরই পাঠোদ্ধার করতে হয়! হায়, এমনি করে'ই কি মানুষ বোঝে! সহজ বুদ্ধি ও সবল কল্পনায় যে বর্ত্তমানকে বুঝলো না, পুরাণো-পুঁথির মিউজিয়মই কি সেই বোঝা তার মাথায় চাপিয়ে দেবে?

প্রবীণের কাছে নবীন কোন্ মন্ত্র নেবে? আব্রহ্মস্তম্ব সবই গুরুকৃপায় মেলে শুনেচি, কেবল মেলে না সাহিত্য-সৃজনের শক্তি। ডাক্তার হওয়ার বাঁধা পথ আছে, সাহিত্যিক হওয়ার নেই। চিত্রবিদ্যারও স্কুল হয়েচে, কিন্তু সাহিত্য-শিক্ষার এখনো হয়নি।

কবি বলচেন—সাহিত্যে চিরন্তন সত্য মেনে চলতে হবে।

সত্য-শিব-সুন্দর—এই সব মামুলি কথা এত মুখে মুখে ফিরেচে যে শুনলেই মাথা নুয়ে আসে, প্রশ্ন করবার শক্তি থাকে না। বাধ্য হ'য়েই নিরুপায় সাহিত্যিকদের এতদিন পড়ে' পড়ে' এদের মার খেতে হয়েচে।

সাহিত্যের সঙ্গে কল্যাণের সম্পর্ক নিয়ে এক দিন খুব প্রচণ্ড তর্কই ছিল, কিন্তু আজ তা মিটেচে; কল্যাণ, নীতি, সামাজিক উন্নীতি, পুণ্যের জয়, পাপের ক্ষয়—এইসব মহৎ কীর্ত্তির সহিত সাহিত্যকে সহমরণে দেবার প্রথা এখন আর নেই। এবং বাস্তবের-সুন্দর ও শিল্পের-সুন্দর যে আলাদা হ'তে পারে তাও লোকে বুঝেচে;

গড়া নতারদামের কুঁজোর অপূর্ব্ব

সৌন্দর্য্যের কাছে অভিভূত হয় এমন রসজ্ঞ আজ বিরল নয়।

কিন্তু চিরন্তন সত্যের তর্ক আজো ঘোচে নি। শিল্পসৃষ্টিতে তাকে মেনে চলার পরোয়ানা বহুদিন থেকেই আছে, কিন্তু পরোয়া না-করেই চলেছেন শিল্প-স্রষ্টারা। চিরন্তন সত্য প্রচারের জন্য বহু তত্ত্ব-গ্রন্থ আছে—কিন্তু সাহিত্য বলে' তাদের কেউ ভুল করে না।

নারীর মাতৃজাতি-সুলভ স্নেহ এবং স্বামীর পত্নীকে ভালোবাসা—চিরন্তন সত্য। অথচ এই চিরন্তন সত্যের অন্যথা করে' কৈকেয়ী রামকে এবং রাম সীতাকে যখন বনবাস দিলেন তখনই রামায়ণের মতো মহাকাব্য সম্ভব হোলো। চিরন্তন অসত্যের সংঘাতেই অনেক সময় চিরন্তন সত্য ভালো ফোটে—এইজন্য তাকেও শিল্পীর ফেলা চলে না; আলোর খেলা দেখাতে হ'লে তাঁকে ছায়ার খেলাই বেশি করে' দেখাতে হয়। কোনো কিছু অপ্রমাণ করে' কেবল সাহিত্যেই প্রমাণ করা চলে—সাহিত্য ও ন্যায়শাস্ত্র এক নয় বলে'ই। (টমাস হার্ডি তাঁর Jude the obscure-বইয়ে জুড্ ও স্যুর প্রেম-সম্বন্ধের সত্যতা স্বীকার

করলেন সেই সত্যকে ব্যর্থ করে' এবং convention-কে পরাজিত করলেন তার জিত মেনে নিয়ে।) অত্যন্ত অচিরস্থায়ী কথা নিয়ে চিরস্থায়ী কাব্যরচনা শিল্পীরই কাজ।

কবি বলচেন—বিধাতার সৃষ্টিতে যা পুনরুক্তি তাই চিরন্তন সত্য। পুরাণোকে নিয়ে সৃষ্টিকর্ত্তা চিরকাল এই পৃথিবীতে ইন্দ্রজাল রচনা করচেন। বিধাতার তাতে যদি লজ্জা না থাকে তবে—...

বিধাতার না থাক, কিন্তু মানুষের লজ্জা আছে। মানুষের শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য্য সর্ব্বত্রই নিত্যই নব। সে-যুগে সিউলি যেমন ফুটেচে আজো তেমনটি ফুটলেই বিধাতার চলে যায়, কিন্তু সে-যুগে মানুষ যা সৃষ্টি করেচে আজ তাতেই দাগা বুলিয়ে তার তৃপ্তি নেই,—তার আজকের রচনার কোথাও হয়তো অতীতের পুনর্মুক্তি ঘটে থাকবে, কিন্তু তাকে পুনরুক্তি বলা চলে না। এখানেই মানুষের কাছে বিধাতার পরাজয়।

"আধুনিক সাহিত্যিকরা ধাঁ করে' চলতে আরম্ভ করেচে" বলে' কবি ক্ষুব্ধ। কিন্তু এতদিন কত সাহিত্যিক যে হাঁ করে' হামাগুড়ি দিয়ে এসেচেন তাতে কবির কোনো ক্ষোভ নেই।

যারা দিকে দিকে যাত্রা সুরু করলো দ্বিগ্বিজয় হয়তো তারাই করবে,—যারা বাঁধাপথে আট্‌কে গেল' পথই বাঁধলো তাদের।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-সাহিত্যিকের মধ্যে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠা করেচেন এ-গর্ব্ব আমাদেরই। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্যের শতদলে বঙ্গবাণীর সিংহাসন রচনা করবে আজকের আধুনিক শিল্পীরা। এই ভবিষ্যৎ এখনও সম্ভাবনার গর্ভে, সত্য বটে। ২০২৮ সালও সম্ভাবনার গর্ভে, কিন্তু তা বলে' তা মিথ্যা নয়।

শনি বনাম অশনি

বাংলার ওমর খৈয়াম ঘুমের ঝোঁকেই যেন বলে' থাকবেন,—"বাক্য উলটি নিলে, কাব্য আপনি মিলে।"

উল্‌টো রকম কথা বললে চমৎকার কবিত্ব হয়—এটা যাঁরা কবিতা লিখে হাত পাকিয়েছেন তাঁদের অজ্ঞাত না, কিন্তু লেখাও যে খেলারই রকমফের, শনিমণ্ডলের পত্ররচনার আগে আমি তা ধারণা করতে পারিনি। শনিবারের চিঠি পড়ে' এখন দেখচি, সাহিত্য-চর্চ্চা ও সাহিত্য-চর্চ্চড়ি একই বস্তু দাঁড়ালো।

শনিবারের চিঠির পৌষ সংখ্যায় আমার 'সাহিত্যিক ধর্ম্ম' সম্পর্কে যে-মন্তব্য বাহির হয়েচে তা এখানে তুলে দিলুম—

"সাহিত্য-সেবক শিবরাম চক্রবর্ত্তীর নাম সবাই জানেন। তিনি 'আত্মশক্তির' পাতায় কূটরাজ-

নীতির আলোচনা স্বরু করিয়াছেন। বুদ্ধি বঁটির মতই কাজের জিনিষ। তরকারি ছাড়িয়া পেন্সিল কাটিতে বঁটিদক্ষ ব্যক্তির সময় বেশী লাগে না। শিবরাম বাবুও নিজ বুদ্ধির জোরে হঠাৎ "সাহিত্যিক ধর্ম্ম" ধরিয়া dissection আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁর গোড়ার কথা ও মাঝের কথার বিষয়ে কিছু বলিবার নাই। শেষ কথাটাই ভাল ও রাজনীতিঘটিত। সাহিত্যে যাঁরা "নবত্ব" আনিতে চান, তাঁহাদের গূঢ় উদ্দেশ্য হইতেছে প্রথমে বাড়াবাড়ি করিয়া পরে একটা "রফা" (compromise) করা। সর্ব্বনাশ! ইহার ভিতর যে এত প্যাঁচ ছিল তাহা আমরাও স্বপ্নেও ভাবি নাই। তবে কি শেষ অবধি রবিঠাকুরকে compromise-এর এক পক্ষে বলাকার ছন্দে লিখিতে হইবে—

একথা জানিও তুমি শ্রমিকস্থদন কল-অলা,
ভগবান কুলি সেজে চাপিয়া ধরিবে তোর গলা।

ইত্যাদি। আর অচিন্ত্য সেন "ঘরে বাহিরে" না লিখিয়া—"ঘরে ঘরে"···কিম্বা···যাক! বুদ্ধদেব কাঁদিবেন,

"বেলা যে প'ড়ে এল জল্‌কে চল্;
নূতন কোন্ ডাকে,

কে যেন ডাকে কা'কে—
কোথা সে চালাঘর বস্তি কল।"

ভগবান! এ যে সাহিত্যের Versailles Treaty!"

নিজের প্রসঙ্গ-সম্পর্কে আমি শুধু এই বলতে চাই যে প্রবাসী শনিমণ্ডল এখনো ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বস্তুর আলোচনায় ততটা পেকে ওঠেননি, এই কারণেই তাঁদের ধান ভান্‌তে শিবের গীত আপনি এসে পড়ে,—এটা কেবল মার্জ্জনীয় নয়, সম্মার্জ্জনীয়।

আমার প্রবন্ধে আমি যা বলতে চেয়েছি তার গোড়ার, মাঝের ও শেষের সম্পূর্ণ কথাটি এই যে, মনের রূপই হচ্চে সাহিত্য। আমার মনে যা ভালো লাগ্‌লো, আমার সাহিত্য-রচনায় তা যদি অপরের মনেও ভালো লাগাতে পারি তা-হলেই আমার ছুটি। কেননা সেইখেনেই আমার নিজের সঙ্গে দেনাপাওনা চুক্‌লো, আপনাকে প্রকাশ করলুম, নিজের ধর্ম্ম পেয়ে গেলুম; বাইরের কোনো গুরুর, বা কোনো দিঙ্‌নাগাচার্য্যের কাছে জবাবদিহি করবার কথা আমার নয়।······

গুরু নিরস্ত হ'তে পারেন, পাঠকরাও নীরব

থাকবেন, কিন্তু দিঙ্‌নাগাচার্য্যের দলকে কে সামলাবে ? তাঁরা আমার রচনার শেষ অংশ থেকে 'রাজনীতিঘটিত কূট অর্থ' আবিষ্কার করেছেন— 'সর্ব্বনাশ ! ইহার ভিতর যে এত প্যাঁচ ছিল তাহা আমিও স্বপ্নে ভাবি নাই !'

"সাহিত্যিক ধর্ম্মে"র সর্ব্ব-শেষ অংশে ইহাই ছিল—"মাইকেল যখন অমিত্রাক্ষর চালান, তখন অক্ষর ছাড়াও অনেক অমিত্র তাঁকে সইতে হয়েচে, বঙ্কিমের ওপরও কম আঘাত হয়নি কিন্তু তিনি তাতে ভাঙেনওনি, বেঁকেনওনি। রবীন্দ্রনাথ শরৎ-চন্দ্রও যে এই সনাতন প্রশস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েচেন এমন বলা চলেনা। এবার অতি আধুনিকদের পালা। সাহিত্যে 'নবত্ব' যাঁরা আন্‌তে চাচ্চেন তাঁদের যে 'শক্তি' আছে (তাঁদের বিরুদ্ধে) এই যুদ্ধ-ঘোষণাতেই তার পরিচয়। (যুদ্ধের) ফলাফল সম্বন্ধে আশঙ্কা করিনে, কেন না এটা সন্ধি করারই অভিসন্ধি, রফা করার প্রথম দফা।"

এই কটি লাইনের মধ্যে কোথাও এমন কোনো ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন নেই যে, "সাহিত্যে যাঁরা নবত্ব আনিতে চান, তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে

প্রথমে বাড়াবাড়ি করিয়া পরে একটা 'রফা' করা।" মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কোনোদিন রফা করতে লালায়িত হন্‌নি, আধুনিক লেখকরাও সেজন্যে কিছুমাত্র ব্যগ্র নন্; তবে কথা হচ্চে এই যে যে-পক্ষ নিজগুণে বারবার পরাভব স্বীকার করে এসেছে রফা তারাই করবে। আজ না হোক্ দু'দশ বছর পরে।

শনি-মন্তব্যের শেষাংশে রবীন্দ্রনাথ, অচিন্ত্য সেন, বুদ্ধদেব 'কি বলিবেন, না বলিবেন—এর' যে-ফিরিস্তি দেওয়া হয়েচে তা চিত্তগ্রাহী ও চমকপ্রদ! সম্ভবত তাঁরা শরৎবাবুর উপদেশমত চতুরাননের কাছে গিয়ে বলবেন, প্রভু! এর চেয়ে যে আমাদের বনবাস ভালো!

অসঙ্গত প্রলাপ ও অসম্বদ্ধ বিলাপ যদি satire হয় তবে সে-lyre যত শীঘ্র ফাটে ততই ভালো।

শনির চেরাগ দিয়ে রবিকে দেখবার দুর্ভাগ্য আমাদের কোনোদিন হবে না, তিনি কী এবং কত বড়ো তা আমরা জানি, তাঁর আলোর ইঙ্গিতও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি;—কিন্তু এই শনি-চক্রের যারা তাঁকে বোঝাবার চক্রান্ত করে' বেরিয়েচে তারা সাহিত্যের বন্ধু নয়, রবির তো নয়ই।

অবশেষে একটা কথা ; ভুল হ'য়ে ফুট্তে পারাটা কিছু নয়, ফুল হ'য়ে ফুট্তে পারাটাই বড়ো। অক্ষমতাবশত যারা প্রথম পথ বরণ করে' নিয়ে উত্তর-পন্থীদের ব্যঙ্গ করাই প্রাত্যহিক জলযোগের আগেকার কর্ত্তব্য করে' তোলে তাদের এই মর্ম্মান্তিক প্রয়াসকে কমেডি বা ট্র্যাজেডি কি বল্‌ব ভেবে পাই না।

কিছুদিন আগে শনিবারের চিঠিতে কোনো ভদ্রলোকের একটি প্রশ্ন দেখেছিলাম— "কতদিন মুদীর দোকানে হিসাব লিখলে মাসিকের সম্পাদক হওয়া যায় ?"

এই কাগজখানা আগে সাপ্তাহিক ছিল, পরে মাসিক হয়েছে, আশা করি, এর সম্পাদকমশাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। কিন্তু কতদিন মাসিকের পৃষ্ঠায় কলম আঁচ্‌ড়ালে হিসাবমতো লিখতে পারা যায়, এ-কথার জবাব কে দেবে ?

আধুনিক নাটক

আধুনিক নাটক সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে যাওয়ার একটা মস্ত অসুবিধা আছে, সেটা হচ্ছে আধুনিক নাটকের অনস্তিত্ব। রাম না জন্মাতে রামায়ণ-রচনা বরং সম্ভব হয়েছিল, কিন্তু যে-বস্তু আদৌ নেই এবং যার জন্মাবার সম্ভাবনা এখনো দেখচিনে তার সমালোচনা ততো সহজ নয়।

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র হ'তে আধুনিক কথা-সাহিত্যিক পর্য্যন্ত উপন্যাস-রচনার একটা সুনির্দ্দিষ্ট অথচ বিভিন্নমুখী ধারার সন্ধান পাই—তার বৈশিষ্ট্যও যেমন, বৈচিত্র্যও তেমনি। কিন্তু নাট্য-সাহিত্যের বেলায় তেমন কিছু পাই না। গিরিশচন্দ্রের পরে আর সকলে, একাদিক্রমে ও একই প্রয়োজনে, তাঁরই কায়দা-কানুন মেনে তাঁরই খাড়া-বড়ি-থোড় নানাভাবে ও ভঙ্গীতে চালাতে চেয়েছেন। একটি মাত্র ব্যতিক্রম—রবীন্দ্রনাথ।

এখানে বলে' রাখা ভালো, গিরিশচন্দ্র বাংলার

গ্যারিক্ হ'তে পারেন, কিন্তু বাংলার শেক্স্পীয়ার তিনি নন্। এই কারণে রঙ্গমঞ্চের তাগিদে তিনি যে-সব নাটক রচনা করেচেন, তা অভিনয় ও নাট্যশালার যেমন খোরাক যুগিয়েচে নাট্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎকে তেমনি পঙ্গু করে' গেছে। নাট্যসাহিত্য রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষী হওয়ার ফলে এই হয়েচে যে নাট্যপ্রতিভা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি—তাই তার না দেখি বৈচিত্র্য, না দেখি বৈশিষ্ট্য।

শেক্স্পীয়ার শুধু পাদপ্রদীপের মুখ চেয়ে নাটক লেখেননি, তাই তাঁর স্বাধীন প্রকাশনার অন্তরে যে-প্রেরণা ছিল নব নব ধারায় নব নব রূপে তার মুক্তি হোলো। তাই সেখানে শেক্স্-পীয়ারের পরে দেখি, ইব্সেন্, মেটার্লিঙ্ক্, বার্ণার্ড শ', বেনাভেঁতে ও গল্সোয়ার্দ্দিকে—কিন্তু এখানে গিরিশচন্দ্রের পরে, এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, দ্বিতীয় কোনো নাট্যরথীর সন্ধান মেলে না যাঁর রচনা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে—এটা নতুন land mark।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জন্মগ্রহণ করেচে কেবল মাত্র এই দাবীর জোরে কোনো নাটককে

আধুনিক বলা চলে না। আধুনিক নাটকের অন্তত দুটি লক্ষণ থাকা চাই; প্রথম, তার নাট্য-রূপে বিশিষ্ট নূতনত্ব; দ্বিতীয় তার নাট্য-রসে আজকের জীবন-সমস্যা। এ দুয়ের যে-কোনো একটি লক্ষণ থাক্‌লেও তাকে সম্পূর্ণ আধুনিক নাটক বলা চল্‌বে না।

প্রথমে নাট্য-রূপের কথাই নেওয়া যাক্। রবীন্দ্রনাথ বলেন—কী বলা হোলো আর্টের দিক থেকে সেটা ততো বিচার্য্য নয়, যতটা কেমন করে' বলা হোলো—এইটে; বিষয়-বস্তুর চেয়ে তার রূপ-রচনা বড়ো।

শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের তুলনায় বার্ণার্ড শ' ও গল্‌সোয়ার্দ্দির নাটকের বিষয়-বস্তু ও রচনা-রীতির পার্থক্য যথেষ্টই,—কিন্তু তাঁদের রচনায় রূপের তফাৎটাই বিশিষ্ট। শেক্‌স্‌পীয়ারের অনুকরণে গিরিশচন্দ্র নাট্যরচনা করেন বহু অঙ্ক ও প্রত্যঙ্কে দৃশ্য-বিভাগ করে'; কিন্তু ইব্‌সেন্ করেন নাট্যরূপের নতুন আমদানি। তাঁর রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্য অনেক-কিছু;—কিন্তু যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে তা হচ্ছে তিনটি বা চারটি দৃশ্যে নাটকের সম্পূর্ণতা।

বিদেশে ইব্‌সেন্ প্রভৃতির যুগ আজ অতিক্রান্ত হ'তে চলেচে, যদিচ এদেশী নাট্য-সাহিত্যে তার উদয়াভাস পর্য্যন্ত হোলো না। আমাদের নাট্যলক্ষ্মী 'ঊষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা, অতি অকুণ্ঠিতা!' চিরন্তন শৈশব তাঁকে বৃদ্ধিগত বার্দ্ধক্য ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করচে' ভালোই সেটা!

ইব্‌সেনের একটা বৈশিষ্ট্য, তাঁর নাটকে স্থান, কাল ও ঘটনার অপূর্ব্ব সঙ্গতি—একই স্থানে, একই বর্ত্তমানে—প্রায়ই দু'তিন দিনের মধ্যে, নাটকের সম্পূর্ণ ঘটনাটা ঘটেচে। আমাদের নাটকের এ-সব বালাই নেই। 'ভীষ্মে' আমরা দেখি, নায়িকার দু দুটো জন্ম নিয়ে নাট্য-লীলা চলেচে, যিনি নায়ক তিনি তাঁর কৈশোরে অভিনয় করতে ষ্টেজে নেমে দেখতে দেখতে বুড়ো হ'য়ে গেলেন- কিন্তু নাট্যস্রোতে কোনো বাধা-বিপত্তি ঘট্‌লো না। 'চন্দ্রগুপ্তে' দেখি এ্যান্টি-গোনাস্ এই গ্রীসে তাঁর মাতৃ-সন্নিধানে, আর এই তাঁকে দেখি ভারতবর্ষে। আমাদের দর্শকের নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিচার উপভোগ-শক্তির প্রশংসা করতে হয়!

বস্তুতপক্ষে, মানুষের জীবনে নাটকের টুক্‌রো-টাক্‌রা এই রকম ছাড়া-ছাড়া ভাবে কখনো ঘটেনা যে সব টুক্‌রোগুলোকে একসঙ্গে জোড়াতালি দিলেই নাটক দাঁড়াবে। এভাবে মানুষের জীবনে যা ঘটে, তা হচ্ছে উপন্যাস,—এবং তা নিয়ে যা লেখা চলে তাও উপন্যাস। মানুষের জীবনে নাটক আসে ঘূর্ণীর মতো : বেশীক্ষণ স্থিতি তার পক্ষে স্বাভাবিক নিয়ম নয়,—এই অল্প সময়ের মধ্যে সে কতকগুলো জীবনে একটা ওলোট পালোট ঘটিয়ে দ্যায়—এই ঘূর্ণীর স্রোতে কেউ ছিট্‌কে আসে, কেউবা ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়—এই নিয়েই জীবনের কমেডি ও ট্র্যাজেডি।

এখানে কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন—সামাজিক নাটকে এটা চলতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকের বেলায় সময় স্থান ও ঘটনার সঙ্গতি রাখা কি করে' সম্ভব ? যেখানে কতকগুলো ঘটনা বহুপূর্ব্বে ঘটে' গেছে এবং যে-তথ্যগুলো এই নাটকীয় ঘটনার মৌলিক কারণ, সেখানে নাট্য-রচনায় এগুলো না ঘটিয়ে এড়িয়ে যাবার পথ কই ?

এর জবাবে, ইব্‌সেনের পদ্ধতির দিকে আমি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ইবসেনের Warriors of Helgeland ঐতিহাসিক নাটক, এবং তারও কতকগুলো ঘটনা নাটক সুরু হবার পূর্ব্বে ঘটে গেছে যে-ঘটনাগুলো এই নাটকের গতি ও সমাপ্তিকে প্রভাবিত করে' আছে ;— অথচ ইব্‌সেন্ সেই ঘটনাগুলোকে প্রস্তাবনা-অঙ্ক হিসেবে পুনরায় না ঘটিয়ে, নাটকের পাত্রপাত্রীর মুখে বিবৃত করিয়েছেন ; তাতে নাটকের গতির হানি হয়নি কিছুমাত্র, অথচ সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বেড়েচে যথেষ্ট।

তবে কথা এই যে, ইব্‌সেনের পদ্ধতিটা সহজ নয়, একে আয়ত্ত করতে হ'লে শক্তি ও সাধনার সঙ্গে প্রতিভা থাকা চাই। তাঁর Wild Duck-এ কী দেখি ? —কতকগুলো লোকের জীবনে আগে একটা নাটক ঘটে' গেছে, সেই নাটকটাকেই শেষের দিক থেকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত(unfold) করতে করতে গোড়ার দিকে আসা হোলো—তার ফলে ঘটে' গেল আরেকটা নাটক ; খাঁটি উপন্যাস লেখা খুবই শক্ত, কিন্তু এই ধরণের খাঁটি নাটক লেখা তার চেয়েও শক্ত।

অবশ্য এখানে কেবলমাত্র ইব্‌সেনের পদ্ধতির ইঙ্গিত করে' আমি একথা বলতে চাইচিনে যে তাঁরই অনুকরণে আধুনিক নাট্যকারকে কলম ধরতে হবে। কেননা শেক্সপীয়ারের নাট্য-রীতি অনুসারে লিখলে যেমন তাঁর রচনাকে আধুনিক নাটক বলবো না, তেমনি ইব্‌সেনের নাট্যরূপ ধার নিলেও না। তাঁকে তাঁর নিজের ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ নতুন রূপের উদ্ভাবনা করতে হবে, এবং তাঁর সেই অন্তরের পরিকল্পনাকে পরিমূর্ত্ত করতে হবে দীর্ঘদিনের ঐকান্তিক সাধনায়। তার সন্মুখে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর এই প্রশ্নটি সর্ব্বদা জেগে থাকবে,—হে রূপকার, কোন্ নতুন রূপটি তুমি সর্ব্বকালের জন্য সৃষ্টি করলে?

কিন্তু কেবল রূপই তো সব নয়, রূপের পাত্রে তিনি কী বস্তু পরিবেশণ করতে চান তার ধারণাও তার স্পষ্ট হওয়া দরকার।—

—ইংরেজীতে drama ও play বলে' দুটো শব্দ আছে—এই দুটো অর্থেই আমরা 'নাটক' কথাটিকে প্রয়োগ করে' থাকি। Drama হচ্ছে রঙ্গমঞ্চ-নিরপেক্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে যার রচনা —যার অভিনয়ের যোগ্যতা রঙ্গমঞ্চকে অর্জ্জন

করতে হবে ; আর play হচ্ছে তাই যাকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের যোগ্য করে' লেখা হয়েচে। play-বইয়ে, অভিনেতাদের সুবিধার জন্য মাপ-সই ভূমিকা বসাতে হয় ; আর দর্শকদের খুসীর জন্য তাগ্-মাফিক্ দিতে হয় প্রস্তাবনা, নৃত্য-গীত, ডুয়েট্, গাজনের সং, সঙ্গীত-সংগ্রাম, ম্যাড্সিন্, ডাইং স্পীচ্ ও উজ্জ্বল দৃশ্য ইত্যাদি। এককথায় প্লে-বই কাটে হাততালিতে ; আর ড্রামা বই কাটে পোকায়, যেমন রবীন্দ্রনাথের রক্ত-করবী ও মুক্তধারা প্রভৃতি।

সুতরাং বাছাই করতে গেলে দেখ্তে পাব, নাট্য-সাহিত্যে ড্রামা দুচারটি মাত্র, প্লে-ই সব। 'প্রফুল্ল' নাটকে আমরা কী দেখি ? যে-মা আর সব ছেলের মুখ চেয়ে পুত্র-শোক পর্য্যন্ত হজম করেন, তিনি ছেলের দুচার দিনের জেল হওয়াতে কী বিচিত্র পাগলামিই না সুরু করলেন ! 'দৃশ্য'-তৈরি করে' অভিনয় জমানোর জন্যই এই অস্বাভাবিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়েচে—আধুনিক নাটকে এ-সবের আশ্রয় নেই। 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ স্বকীয় চেষ্টার ফল 'রমা'ও ঠিক এই-রকম দর্শকের-মুখ-চেয়ে লেখা,

—তার ফলে বইখানি drama হ'তে পারেনি, হাততালি-দৃশ্যে বোঝাই হ'য়ে, চলনসই রকমের play হয়েচে মাত্র।

আধুনিক নাট্যকারকে এই সুলভ যশের সরল পথ বর্জ্জন করে' নিজের জন্য নতুন পথ কেটে চলতে হবে। নাট্যরূপের দিক দিয়ে তিনি যেমন আন্‌বেন নতুন-কিছু, নাট্যরসের উদ্বোধনের দিক দিয়েও তাঁর প্রয়োগ-কৌশলে থাক্‌বে অপূর্ব্ব-কিছু।

আধুনিক ঔপন্যাসিক, মানুষের জীবনে 'উপন্যাসকে' যে-রকম ঘট্‌তে দেখেন সেই রকম তাকে চিত্রিত করেন। আধুনিক নাট্যকারেরও উচিত হবে, মানুষের জীবনে 'নাটক' যে-রকমটা ঘটে' থাকে, ঠিক-তাকেই তাঁর নাটকে স্বাভাবিক প্রতিরূপে প্রকাশ করা। আর্ট ফোটোগ্রাফি নয়—এ কথা সত্য এবং অনেকে বলে থাকেন; কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, ফোটোগ্রাফিও আর্টে পরিণত হ'তে পারে আর্টিষ্টের দৃষ্টি-নৈপুণ্যে ও সৃষ্টি-কৌশলে। সিনেমা-ফিল্‌ম তো আগাগোড়া ফোটোগ্রাফি ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু তা আর্ট নয়, এ কথা কে বল্‌বে?

নাট্য-রচনায় প্রথমে রূপের কথা। তিন চার ডজন দৃশ্য না থাক্‌লে এদেশে নাটক তৈরি হয় না, সেখানে আধুনিক নাটক একটি মাত্র দৃশ্যে সম্পূর্ণ হবে। এই নাটকের অভিনয়ে সময় লাগবে না বেশি এবং এর-মধ্যে নৃত্য-গীতাদি অনাবশ্যক বাহুল্য থাক্‌বে না আদৌ। স্থান-কাল-ঘটনার সঙ্গতি এত নিবিড় হবে যে নাট্যোল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ থাক্‌বে না এবং সুরু হবার পরে, একেবারে গিয়ে যবনিকাপাত হবে—মধ্যে কোনো সাময়িক বিরতি (interval) পর্য্যন্ত থাক্‌বে না।

তারপরে, রস-সৃষ্টির দিকে দিয়ে স্থূলতর প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে' রসোদ্বোধন করা এর কাজ হবে না—মানুষের সূক্ষ্মতর অনুভূতিতে আন্দোলন সৃষ্টি করাই হবে এর লক্ষ্য। পাত্র-পাত্রীরা বক্তৃতার চেয়ে ইঙ্গিত করবে বেশি, এবং সমাধানের চেয়ে সঙ্কেত হবে বড়ো।……

সাধারণ নাটকে প্রায়ই দেখা যায় একটি বা দুটি চরিত্র আর-সব-চরিত্রের মাথা খেয়ে অসঙ্গত ভাবে বেড়ে উঠেচে—এবং বাকি চরিত্রগুলো সেই দুটি চরিত্রকে ফোটাবার জন্যই যেন আত্ম-সমর্পণ

করেচে ;—'প্রফুল্লের' যোগেশকে ফোটাবার জন্য বেচারা রমেশ-সুরেশ প্রভৃতির প্রাণপণ চেষ্টা দেখলে দুঃখ হয়। আত্মোৎসর্গের দিক দিয়ে এটা খুব বড়ো আদর্শ—কিন্তু আধুনিক নাটক-রচনায় এই আদর্শকে আমল দেওয়া চলবে না। এমন ভাবেচরিত্রগুলিকে সঙ্গতি দিতে হবে যাতে তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে—প্রত্যেককেই নাটকের মুখ্যপাত্র বা পাত্রী বলে' মনে হবে,—যেমন দেখি গোর্কির Lower Depths-এ।

আসলে আধুনিক নাটকে চরিত্র-সৃষ্টির কোনো বাড়াবাড়ি থাক্‌বে না—আধুনিক নাট্যকার মানুষের কতকগুলো type না দেখিয়ে, মানুষের lifeটাকেই বড়ো করে' দেখাবেন। এরপর ট্রাজেডি-রচনার সময়, যে-মানুষটি বা যে-দুটি নরনারী ব্যর্থ হ'য়ে গেল তাদের ওপরই কেবল দৃষ্টি আকর্ষণ না করে', যে-কারণে তারা ব্যর্থ হোলো সেই অবস্থানের (situation) ওপর আলোকপাত করা অধিকতর আর্টিষ্টিক হবে।

'রমা'-নাটকের মধ্যে দৈবক্রমে এই আধুনিক লক্ষণটি আছে। রমা ও রমেশের ব্যর্থতার দিকে গ্রন্থকার তত বেশী জোর না দিয়ে, তারা

যে-কারণে ব্যর্থ হোলো সেই পল্লীসমাজের পারিপার্শ্বিক চিত্রটাই বেশী করে' ফুটিয়েছেন,—কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রাহসনিক (farcical) রূপ দেওয়ার চেষ্টা করায় তাঁর ট্রাজেডির উদ্দেশ্যেরই অপঘাত ঘটেচে। এদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও সার্থক রচনা রবীন্দ্রনাথের 'গৃহ-প্রবেশ'। একমাত্র এই বইখানিকেই আমরা 'আধুনিক নাটক' বলে' অভিহিত করতে পারি।

আগে চরিত্রগুলোকে ফুটিয়ে তোলার জন্য কতকগুলো situation তৈরী করা হোতো এবং এখনও হয়; কিন্তু এর পরে কেবল situation-টিকেই ফুটিয়ে তোলার জন্যই কতকগুলো চরিত্র-সৃষ্টি করা হবে। জীবনের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে—নরনারী তার ঢেউ মাত্র; ঢেউকে একান্ত ভাবে দেখাবার কোনো সার্থকতা নেই, ঢেউগুলিকে ততখানি ও তেমনি ভাবে দেখাতে হবে যাতে তরঙ্গলীলা অতিক্রম করে' অখণ্ড জীবনধারার গভীর পরিচয় পাই। বিচিত্র কোণ থেকে বিচিত্র আলোকপাত করে' সেই বিচিত্র জীবনকেই সম্পূর্ণ ভাবে দেখাতে হবে তার প্রতিদিনের ব্যর্থতা ও সার্থকতার মধ্যে।

আধুনিক সমালোচনা

'সাহিত্য' শব্দের উত্তরে 'ষ্ণিক্' প্রত্যয় করে' হয় সাহিত্যিক ; আর সাহিত্যের উত্তরে stick প্রযোজ্য এই প্রত্যয় থেকে হয় সমালোচক। উকীল হ'তে হলে ল পড়তে হয় এবং তার প্রয়োগ জান্‌তে হয়,—কিন্তু আড়ম্বর সহকারে হ য ব র ল বকে' গেলেই আজকের দিনে হয় সমালোচনা।

যে সুন্দর সে আপনিই সম্পূর্ণ,—সম্পূর্ণতর হবার জন্যে তাকে চেষ্টা কর্‌তে হয়না ; অনন্তের সহিত রহস্যময় সংযোগে তার দেহ-মন অনুক্ষণ রূপায়িত রসায়িত। যে সুন্দর হ'তে পারেনি তারই লজ্জা মোচনের জন্য দরকার কলাকুশলতার সৃজন-ক্ষমতার,—তাকে আর্টিষ্ট হ'তে হয়। কিন্তু আর্টিষ্টও যে হ'তে পারল না সে-বেচারার অগৌরব স্খালনের একমাত্র উপায় পণ্ডিত হওয়া। এবং

পাণ্ডিত্যকে কাগজে কলমে জাহির করতে গেলে যে-আকার ধারণ করে তারই নাম আলোচনা, সমালোচনা,—যদিচ তাতে আলো সামান্যই, চোনাই বেশি।

যে হ'য়ে-উঠ্‌তে পারেনি তারই কিছু ক'রে-ওঠার দরকার। কাজেই সে যুদ্ধ বাধায়, কিম্বা সমালোচনা করে। এবং দুটো প্রায় একই জিনিষ—কেবল, একটা অসি নিয়ে, আরেকটা মসী দিয়ে।

বারো হাত কাঁকুড় হ'লে বীচি তার তেরো হাতই হবে। তাই আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে তাল ঠুকে' যে-জিনিষটি সমানে গড়ে' উঠ্‌চে তারই নাম আধুনিক সমালোচনা।

গল্প লিখ্‌তে হ'লে আর্টের দরকার, কিন্তু সমালোচনা লেখায় তার প্রয়োজন নেই মোটেই; কেবল আর্টলেস্ নয়, হার্টলেস্ হ'লে তার পক্ষে আরো ভালো। সমালোচনার নিজের যদি কোনো মর্ম্ম না থাকে, অপরের মর্ম্মভেদ করাই হ'য়ে ওঠে তার কাজ।

আমার ভালো লাগে না, বা এই রকমটা লাগে—এই নিয়ে সাহিত্যের বিচার হ'তে পারে না। সাহিত্যিকেরো।

—কিন্তু এই রকম বিচারই এ দেশে কাব্য বিশারদের আমল থেকে চলে আস্চে। বর্ত্তমান কালে যাঁরা কাব্যের বিশারদ তাঁরাও এই প্রথার অন্যথা করেন নি।

এক কথায় কোনো কবির কাব্য বিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—এঁর কবিতায় পৌরুষের পরিচয় আছে। যাঁকে নিয়ে কথা, তিনি এই সার্টিফিকেট্ পেয়ে মোহিত হয়েছিলেন কি লাল হয়েছিলেন তিনিই জানেন,—কিন্তু কবিতার বিচারে এ কেমন কথা ?

মনে করা যাক্, তাঁর না হ'য়ে যদি কোনো মহিলা কবির রচনা হোতো, তাহলে কি রবীন্দ্রনাথ বল্‌তেন—এঁর কবিতায় নারীত্বের পরিচয় পাই ?

কবির কবিত্ব আছে কিনা, কবিতা কবিতা হয়েচে কিনা—এই ছিল প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ বল্লেন—পৌরুষ আছে। উত্তর হয়তো খুব স্পষ্ট হোলো, কিন্তু সম্ভবত খুব যথার্থ হোলো না।

পণ্ডিচেরীর পণ্ডিতমশায়ের হাতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যেরও এই দুর্ব্বিচার ঘটেচে। তিনি সত্ত্ব-রজ-তমের চুলচেরা হিসেব করে' আবিষ্কার করেচেন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যা আছে তা শুদ্ধ রজোগুণ! কিন্তু এই বিচারের বিশেষত্বে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ খুসি হ'তে পারেন নি—না হবারই কথা! তা না হন তিনি, নলিনী গুপ্ত মশায়ের তাতে কিছু যায় আসেনা,—তিনি সর্ব্বদাই ত্রিধাগ্রস্ত হ'য়ে আছেন, এইজন্য দ্বিধাগ্রস্ত তিনি খুব কমই হন—কবিতার বিচারে তো নয়ই।

পণ্ডিচেরীর বিচারে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কবিত্ব না থাক্ তবু রজোগুণটা ছিল,—কিন্তু ঢাকার বিচারে তাও আর রইলো না। ঢাকার মতে, রজোগুণতো নেইই, ঐ সঙ্গে নেই divine element—Imagination আর human element—Passion-এই দুই বস্তুও। পণ্ডিচেরীর ভাষায় কথাগুলোর অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এই যে, সত্ত্ব আর তমো গুণও শূন্য!—তিন তিনটা গুণ দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেল, রইলো পড়ে' রবীন্দ্রনাথের কবিতা—নির্গুণ, অসাড়, 'ঠাণ্ডা'! অদ্ভুত ব্যবচ্ছেদ!

রবীন্দ্রনাথ কবি নন্ এ কথা যদি কারু মুখে একবার শুনি ভাব্ব এটা স্লিপ্ অফ্ দি ট্যং, কিন্তু দু'বার শুন্‌লে মনে করব, তা নয়, স্লিপার অফ্ দি ট্যং !

অতি আধুনিক সমালোচকের মতে, কবি হ'তে হ'লে ব্রুটাল্ হ'তে হবে, এবং সাদা হাঁস ডিম এ সব না থাক্‌লে ভালো কবিতা হ'তে পারে না।

সে বিষয়ে আবার সন্দেহ ! কেননা কবি হ'তে হ'লে আর যাই হ'তে হোক্, কবি যে হ'তে হবে না এ তো স্বতঃসিদ্ধ। আর সাদা হাঁসের ডিম দিয়ে ভালো কবিতা প্রস্তুত হবে এ বেশি কথা কি, যখন তা দিয়ে ভালো মাম্‌লেট্ হ'তে পারে ?

কিন্তু অপরের সমালোচনাই তো সব নয়, নিজেরো কিছু করা চাই। এই সেলফ্-হেলপ্-এর যুগে নিজের ঢাক নিজে না পিটে উপায় নেই—এ অতি কঠোর সত্য। কাজেই বল্‌তে হয় সমস্ত কবির মধ্যে 'সাদা' সব চেয়ে বড়ো কবি, কেননা তাঁর কবিতার অত্যন্ত সাদাসিধে ভাব ; কিন্তু 'হাঁস' তাঁর চেয়েও বড়ো, কেননা তাঁর অ-সংস্কৃত

অসম্বদ্ধ বক্‌বকম্ অভূতপূর্ব্ব ;—কিন্তু 'ডিম' তাঁকেও কোনো কোনো বিষয়ে ছাড়িয়ে গেচেন ! যাবেনি তো ; যদিচ তিনি এখনো ফোটেন নি, তবু পুরো হাঁসটাকেই যে সংক্ষিপ্ত আকারে নিজের অভ্যন্তরে বহন করচেন,—অধিকন্তু তাঁর খোলা ! প্রোপ্যাগাণ্ডা ভালো, কিন্তু তার জন্যে বুদ্ধির দরকার,—আধুনিক Budhism-এ তার পরিচয় নেই ।

কবিতা বুঝতে হ'লে এবং কবিকে বুঝতে হ'লে অন্ততঃ কিছু পরিমাণে কবিধর্ম্মী হওয়া চাই—কবির-মর্ম্ম না থাক্‌লে কবিতার মর্ম্ম বোঝা কঠিন। কেবলমাত্র ব্রুটাল মন নিয়ে পুলিশ কোর্টের রিপোর্ট বোঝা চলে, কবিতা বোঝার পক্ষে তাই যথেষ্ট নয় ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ইম্যাজিনেশান্ নেই ! দি ইম্যাজিনেশান্ ! তাঁর 'হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি—' এই একটিমাত্র কবিতার মধ্যে যে বিপুল যে বিরাট কল্পনার লীলা আমরা দেখি—পৃথিবীর আর কোনো কবির কাব্যে তার-কাছাকাছি-যায় এমন কিছু নেই ।

কিন্তু হায়, চেরাপুঞ্জি থেকে গোবি সাহারা পর্য্যন্ত কল্পনার পেছনে দৌড়েই যে কাহিল, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করে' অসীম শূন্য ব্যেপে' কল্পনার এই বিপুল গতি তার কাছে মনে হবে, কী নিশ্চল ! পৃথিবী যে ঘুরচে সম্ভবত এও তাকে সহজে বোঝানো যাবে না—কিন্তু বোঝাবার আরেক উপায় আছে, তার প্রয়োগ মস্তিষ্কে নয়, যৎকিঞ্চিৎমাত্র পেটে। কেবল নেশানল (national) কাজেই নয়, কাব্যের বিচারেও আমাদের নেশার অনল জ্বাল্‌তে হয় !

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নাকি প্যাশান্ কম ! এ কথা যে বলে তার জন্য সত্যিই কম্‌প্যাশান্ হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কল্পনার যেমন বিচিত্র বিহার, তেম্‌নি প্যাশানের অপূর্ব্ব রূপ। কিন্তু সে স্থূল রূপ নয়, স্থূল মনে ও মস্তিষ্কে সাড়া জাগানো তার কাজের বাইরে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে যে প্যাশানের বেগ তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম—ইথর-তরঙ্গের মতো আলো ব'য়ে দেওয়া তার কাজ, আঘাত দেওয়া নয়। মনের মধ্যে ঝড়ের মাতন জাগানো তার নয়, তার হচ্চে আলোর মাতন। এক কথায় তা হচ্চে প্যাশান্ অফ্ দি

সোল্— আত্মার আকুতি। 'পর্ব্বত চাহিলো হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'—এর মধ্যে যে দুর্দ্দমনীয় আবেগ, তার তুলনা কোথায় ?

'ক্ষণিকা' ও 'বলাকা' এ যেন রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার দুই উত্তুঙ্গ চূড়া—কাঞ্চনজঙ্ঘা, আর 'এভারেষ্ট'। এদের চূড়ায় দাঁড়ালে পৃথিবীর বড়ো বড়ো পাহাড়কেও ছোটো মনে হয়। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি বল্‌লে খুব সামান্যই বলি, তিনি বিশ্বের সকল কবির বিস্ময়।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেষ্ঠতম কবি নন্, শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম—এইরূপ অদ্ভুত কথা সেদিন শুন্‌লাম। কথাটা নগণ্যতম ; কিন্তু কথার পেছনে যে-মনস্তত্ত্ব আছে তা গণণা না করে' উপায় নেই। হিমালয় ভারতের উচ্চতম গিরি না, উচ্চ গিরিদের অন্যতম, একথা কেউ যদি গম্ভীর ভাবে বলে, তাকে হেসে ওড়ানো যায় না ; তার সম্বন্ধে ভাবতে হয়।

হিমালয় একটিই ; আর সব পাহাড়ের

পক্ষে অত উঁচুতে উঠে, অত দিগন্তে দৃষ্টি প্রসার করা দুরাশা মাত্র; তবু যদি কেবল কাঠিন্যের প্রমাণ দিয়েই হিমালয়ের সমতুল্য হ'তে পারি, মন্দ কি ?

কিন্তু, কবি বল্‌ব কাকে ?

নিশ্চয়ই কবিতা-লেখক মাত্রকেই নয় ! কবি বল্‌ব তাঁকেই, যিনি তাঁর কবিতা-রচনার মধ্যে বিশিষ্ট কাব্যলোক সৃষ্টি করতে পেরেছেন। যাঁর কবিতার বই পড়তে বস্‌লে মনে হবে, এক স্বতন্ত্র কাব্যজগতে প্রবেশ করলেম, যে রূপ-রসের স্বাদ এখানে পাচ্ছি তা কেবল এখানে পাওয়াই সম্ভব।

এই কাব্যলোক যাঁর যত সম্পূর্ণ হবে তাঁকে তত-বড়ো নয়, ততো সার্থক কবি বল্‌ব। বড়ো বল্‌বনা এই জন্যে যে, কবি হিসেবে কেউ কারু চেয়ে বড়ো হ'তে পারেন না, কেবল বিশিষ্ট হ'তে পারেন ; স্বাদের বিচারে আমকে লিচুর চেয়ে বড়ো বলতে পারিনে, বল্‌তে পারি—এ আলাদা।

রবীন্দ্রনাথের পরে, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল

ও নজরুল্ ইস্‌লামের এক একটি কাব্যলোক,—স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ। (আধুনিক কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, ও জসীমউদ্দিনের কাব্যলোক এখনো সম্পূর্ণ হ'য়ে না উঠ্‌লেও, এঁদের কাব্য-রচনায় বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া গেছে ইতিমধ্যেই।) তবে রবীন্দ্রনাথকে এঁদের (সবার) চেয়ে বড়ো বল্‌ব কেন? এই হেতু যে, রবীন্দ্রনাথ একটি-মাত্র কাব্যলোকের কবি নন্, তাঁর একাধিক ও বিচিত্র কাব্য-জগত। তাঁর মানসী, সোনার তরী, খেয়া, ক্ষণিকা, গীতাঞ্জলি, নৈবেদ্য, বলাকা, পলাতকা, শিশু ও পূরবী—এর প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ কাব্য লোক।

কবি বল্‌তে যে-ধারণা হয়, বা যত দূর ধারণা করতে পারি, তা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাগাল পাই না। কবি বল্‌তে বুঝি এমন একটি কাব্য-স্রোত যা বিশিষ্ট খাতে বিচিত্র রূপে ব'য়ে চলেচে,—কিন্তু তা একটি নদীরই স্রোত; তার গভীরতায়, তার গতিবেগে, তার রূপ-বৈচিত্র্যে যতখানি তার সেই-বিশেষ-নদীত্ব ততখানিই তার সার্থকতা।

এই নদী-জাতের কবিদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো তার একটা তুলনা চল্‌তে পারে, কিন্তু তার মধ্যে অবিচারের আশঙ্কাই বেশি, কেননা সেখানে ব্যক্তিগত পছন্দটাই বড়ো কথা।

আমার ব্যক্তিগত মত্‌ কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন—বাংলাদেশের কে সবচেয়ে বড়ো কবি ?

আমি বল্‌ব—যতীন্দ্রনাথ। এই হেতু বল্‌ব যে তাঁর নদীর স্রোত আমাদের বেশি জোরে টানে, বেশি দূরে টানে ; তার বুকে ভাস্‌লে ডাঙার কথা আমরা ভুলি।

কিন্তু প্রশ্ন হবে—কেন রবীন্দ্রনাথ ? তিনি কি সবচেয়ে বড়ো নন্‌ ?

তার উত্তর আমার এই—তিনি যে একমাত্র কবি।

তাঁর তুলনা তিনি ; তাঁর সঙ্গে পৃথিবীর আর কোনো কবিরই তুলনা চলে না। প্রত্যেক কবিকে যদি নদী মনে করি, তবে রবীন্দ্রনাথকে মনে করতে হয় সমুদ্র ; কেননা একাধিক নদীর স্রোত তাঁর মধ্যে মিশেচে,—অতীতের ও বর্ত্তমানের, প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সমস্ত কবি তাঁর অন্তরে এসে অত্যন্ত সহজে মিলিত হয়েচে।

প্রশ্ন উঠবে, তাই যদি হয়, তবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য কই ?

অসংখ্য নদীকে আত্মসাৎ করেও সমুদ্রের যে-নিজস্বতা, সেই নিজস্বতা রবীন্দ্রনাথের।

শেষ প্রশ্ন এই থাকে, তবে কি রবীন্দ্রনাথের মতো কবি আর সম্ভব নয় ?

এর জবাব একমাত্র অনন্ত-রহস্যই দিতে পারেন, যিনি আত্মপ্রকাশের নিজের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি করেছিলেন। বিশ্বের অন্তরের মধ্যে কবির বাস—কোনো বিশিষ্ট মানুষের মন যখন তাঁর সঙ্গে এক হয় তখনি সেই পথে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। আমরা ব্যক্তিটিকে বলি কবি, কিন্তু ভুলে যাই তাঁর মধ্যে কবির বাসা হয়নি, তিনিই কবির মধ্যে বাস করচেন! যেমন গানের যন্ত্র, তার-নিজের মধ্যে কিছু সুর নেই, সুর আছে বাহিরের শূণ্যাকাশে—কিন্তু যন্ত্রের মাহাত্ম্য এই যে সেই-সুরকে সে-ই শুধু ধরতে পারে।

আধুনিক সমালোচকের মন হয়তো এখানেও প্রশ্ন করবে,—অনন্তের যোগই যদি আসল কথা, তবে তো তদ্-যোগে সব কবিই সমান দাঁড়ায় !

এইখানেই গণিতের সঙ্গে কাব্যের তফাৎ, আইনষ্টাইনের সঙ্গে শেক্স্পীয়ারের।

নদীর বুকেও আকাশের ছায়া, সমুদ্রের বুকেও।

—কে বড়ো ?

আজ এবং আগামী কাল

সমাজে

স্বাধীনতা আজ দূরে, তাই দূর থেকে তাকে আজ লক্ষ্যের (goal) মতো দেখায় বটে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করলে দেখতে পাবো সেইখানেই পথ সমাপ্ত হয় নি। তখন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করাই হবে লক্ষ্য। সোসিয়ালিষ্ট সমাজতন্ত্রের যেখানে পথ শেষ হয়েচে সেইখানেই আমাদের গতি-সমাপ্তি নয়, তার পরেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের প্রভেদ আছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে রাশিয়া তার আত্ম-সাধনার ফলে সর্ব্বমানবের যে-কল্যাণ আহরণ করেচে তার থেকে আমাদের বঞ্চিত রাখতে হবে। রাশিয়া প্রত্যেক মানুষের মুখে রুটি দেবার ব্যবস্থা করেচে; কিন্তু যেহেতু রুটি দেওয়াটা অতি সামান্য কাজ, তার চেয়ে অমৃত দেওয়া ঢের বড়ো সেইজন্য রাশিয়ার অর্থনীতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারতের আভিজাত্যিক আত্মসম্মানে ঘা লাগবে, একথা মানতে পারিনে। প্রত্যেক মানুষকে যদি অমৃতের সন্ধান দিতে পারি সে তো ভালোই, কিন্তু আগে তাকে রুটির সন্ধান দিয়ে তার পরে।

ভারতের বৈশিষ্ট্য আছে, ঐশ্বর্য্য আছে,—ভারতেরও মানুষকে দেবার নিজস্ব-কিছু আছে একথাও অস্বীকার করব না। ভারতকে অমৃতের সন্ধানই দিতে হবে। এবং এই জন্যই, জগতের সভ্যতায় রাশিয়ার কাজ যেখানে শেষ হয়েচে, একমাত্র সেইখানেই ভারতের কাজ সুরু হ'তে পারে। রাশিয়া মানুষকে ভাণ্ড যোগালেই ভারত সেই ভাণ্ডে অমৃত-রস বিতরণ করতে পাবে। এই জন্যই সমাজতন্ত্রের পথকে এড়িয়ে গেলে মানুষের চলবে না সে-পথ মানুষকে পেরিয়ে যেতে হবে।

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী

সুপ্রসিদ্ধ চিন্তা-শিল্পী নলিনীকান্ত এবার বোলশেভিকির বিরুদ্ধে কলম ধরেচেন—'আত্ম-শক্তির' পৃষ্ঠায়। তাঁর চিন্তা আজকাল আর্ট হিসেবে পারফেক্ট হ'য়ে উঠেচে। তাঁর চিন্তার ফলে, অর্থাৎ তাঁর প্রবন্ধে আমরা দেখতে পাই সত্যবস্তুরা তাদের স্বাভাবিক বিরোধিতা ও বন্ধুরতা হারিয়ে ভাগে ভাগে খাপে খাপে অর্থাৎ তিনি যেমনটি চান সেইভাবে বেশ মোলায়েম হ'য়ে মিলে যায়—সত্যের সেই আর্ট-রূপকে আমরা অসঙ্কোচে গদ্য-কাব্য বলে' মেনে নিতে পারি।

নলিনীবাবু প্রত্যেক বিষয়ই তিন ভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী ; এবং যার বিপক্ষে তিনি বলতে চান দয়া করে' তার স্বপক্ষেও কিছু বলেন। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল, সত্ত্ব-রজ-তম, সত্য-শিব-সুন্দর,

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য, দেহ-মন-আত্মা ইত্যাদি বস্তু ও অবস্তুনিচয় বহুদিনের স্বভাববশত তিন ভাগে ভাগ হ'য়ে থেকে তাঁর অনেকটা সুবিধা করে' রেখেচে। আমি মনে করেছিলুম তিনি বোলশেভিকিরও ঐরকম একটা ভাগযোগ করে' ওরও একটা ব্যবস্থা করে' দেবেন। সম্ভবত তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টাতেও ঐ বস্তুটি ত্রিধাগ্রস্ত হ'তে না চাওয়ায় তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করেচে—তিনি ধরে' নিয়েচেন ওটা existing order-এর বিরুদ্ধে। এবং তাই তিনি নিজেকেও ওর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েচেন।

গোড়াতেই বলে' রাখি, বোলশেভিকির পক্ষ সমর্থনের জন্য আমি কলম ধরিনি ; কেননা বলশেভিজম অনেক বড়ো বড়ো আক্রমণ সয়েও টিকে আছে এবং আশা করি নলিনীবাবুর ধাক্কাও সে সামলে উঠবে। আমি চিন্তিত হ'য়ে পড়েচি গীতা-উপনিষদ ইত্যাদি আমাদের ঘরোয়া সেকেলে জিনিষগুলোকে রক্ষা করতে। কারণ নলিনীবাবু যে-ভাবে গীতা-উপনিষদের মতো অতি পুরণো মাপকাঠি দিয়ে বোলশেভিকির অতি আধুনিক ও অতি বিরাট বিশ্বরূপ মাপতে লেগেচেন তাতে

আমার আশঙ্কা হয়, তাঁর মানদণ্ডের প্রাণদণ্ড হবার যোগাড় হয়েচে !

আমার বিশ্বাস গীতা উপনিষদের তত্ত্ব দিয়ে বোলশেভিকির তত্ত্বের বিচার হ'তে পারে না, যেমন বোলশেভিকির মতবাদ দিয়ে গীতা-উপনিষদের তত্ত্ব-নির্দ্ধারণ অসম্ভব। দুটো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। বোলশেভিকির বিরুদ্ধে তাঁর 'প্রধান অভিযোগ এই যে, উহা নাস্তিক্য-বুদ্ধি, গীতার কথায়, তামস-জ্ঞান-প্রসূত।' কেননা, 'মানুষ যে দেবতা, মানুষ যে ব্রহ্ম, মানুষ যে ভগবান স্বয়ং—এই সকল কথা তাহার কাছে কেবল যে অবাস্তর এমন নয়, ইহাদিগকে সে মনে করে মানুষ-মারা বিষ-মন্ত্র।'

তাহলে বোঝা যাচ্চে, নলিনীবাবুর মতে, মানুষ যে দেবতা, মানুষ যে ব্রহ্ম, মানুষ যে ভগবান্ স্বয়ং—এই সকল অতি-বাস্তব সত্য কথায় দৃঢ় বিশ্বাসই হচ্চে একমাত্র দিব্য জ্ঞান ; এবং বোলশেভিকরা যদি মনে করে মানুষ কেবলমাত্র মানুষ, তার বেশি কিছু নয়, এমন কি দেবতা ব্রহ্ম ও ভগবান—তিনটার একটাও সে নয় তাহলে সেটা তাদের নাস্তিক্য-বুদ্ধির রীতিমত বিজ্ঞাপন !

পৃথিবীতে nonsenseএর proportion খুব বেশি—তার মধ্যে বাস করে' sense of proportion থাকাটা যে ঘোরতর তামসজ্ঞানের পরিচয় এ বিষয়ে আমি নলিনীবাবুর সঙ্গে একেবারে একমত। তবে এগুলো 'মানুষ-মারা বিষ-মন্ত্র' কিনা এ বিষয়ে ঈষৎ সন্দেহ আমার থেকেই যাচ্চে, কেননা চোখের ওপর দেখচি এই বিষ-মন্ত্রে, অনেকগুলি গুণী ব্যক্তি, মারা না পড়ুন, দস্তুরমতো কাবু হ'য়ে রয়েচেন!

গীতা-উপনিষদের বাক্য আমরা নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিচারে মেনে নিই, কেননা ওসব প্রাচীন বলে'ই সত্য এবং সম্ভবত সত্য বলে'ই প্রাচীন। কিন্তু এও তো মিথ্যে নয় যে, আর সব কিছুর মতো সত্যেরও জন্ম, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের কাল আসে—সেও যথানিয়মে নবীন সত্যকে স্থান ছেড়ে দিয়ে প্রাচীন পুঁথির মিউজিয়মে দেহরক্ষা করে। সত্যসত্যই যদি কোনো কালে মানুষ ভগবানরূপে দলে দলে বিচরণ করে' থাকে, এখন আর তাদের সশরীরে দেখতে পাওয়া যায় না—কাজেই নলিনী বাবুর কথিত সত্য এখন আর জীবন্ত হ'য়ে নেই, পুঁথির পাতায় নির্ব্বিকল্প আশ্রয় গ্রহণ করেচে।

সুতরাং দুঃখ যতই সূক্ষ্ম হোক, যা নেই—তা নিয়ে, যা আছে তার সঙ্গে লড়াই করাটা অসাধারণ আস্তিক্য-বুদ্ধির পরিচয় হ'তে পারে, কিন্তু লড়াইটা শেষাশেষি সুবিধার দাঁড়ায় না !

আমি বলতে চাই, শ্রীকৃষ্ণের গীতার চেয়ে কার্ল্ মার্ক্সের গীতা বড়ো, কেননা এই গীতা আজকের মানুষের জীবনে সত্য হ'য়ে উঠচে—পুরণো গীতার কোনো বচন দিয়েই এই নতুন গীতার সৃষ্টি-শক্তির পরিমাপ করা যায় না। সব্যসাচীর জ্ঞাতি-বিরোধের কুরুক্ষেত্রের চেয়ে লেনিনের শ্রেণী-বিরোধের কুরুক্ষেত্র ঢের বড়ো—আদর্শের দিক দিয়ে, মহত্ত্বের দিক দিয়ে ও সম্ভাবনার দিক দিয়ে। জগতের দুঃখে বুদ্ধদেব কেঁদে আকুল হ'য়ে কঠোর বাস্তবের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন,—কিন্তু লেনিনকে আমি বুদ্ধের চেয়েও বড়ো বলব এইজন্য যে তিনি তাঁর কঠোরতর বাহুর জোরে এই কঠিন বাস্তবকে ভেঙে নতুন করে' গড়তে পেরেচেন। এই ভাঙা-গড়ার অনিবার্য্য ফলে যদি নলিনীবাবুর 'ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই দ্বিজাতি বা অভিজাত বর্ণত্রয়ের বিলোপ' ঘটে থাকে তার একান্ত প্রয়োজন

ছিল বলেই ঘটেচে। তার জন্য দুঃখ করে' লাভ নেই। (১)

(১) নলিনীবাবুর হস্তাঙ্ক অনুসরণ করে' আমিও ফুট-নোটে (যদিও অপরের) একটু মন্তব্য সংযোগ করলুম:

He (Lenin) is a saint, a seer, a practical idealist who saw the vision of a better, saner and healthier humanity and brought out a world-revolution which has already swept away many a throne and kingdom, shattered to pieces many a time-honoured and cherished institutions, established a new order and made a complete readjustment of things economic, social and political.

Despised by some, defied by others—a terror to oppressors and exploiters, and a saviour to the oppressed and exploited—this enigmatical personality is still a force, even after five years of his death, before which the old world with all its time-worn philosophy and parapharnalia of pomp and power is daily loosing its footing.

নলিনীবাবু তাঁর প্রবন্ধের একজায়গায় বলেচেন—অন্তরের ভাবে ও ধর্ম্মে তাহারা (বোলশেভিকরা) শূদ্রই।...নূতন শূদ্রকে সৃষ্টি করিয়া বোলশেভিক তাহার নূতন সমাজের পত্তন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু এই চেষ্টা হইতেছে যাহাকে বলে, পিরামিডকে তাহার চূড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দুশ্চেষ্টা। ফলতঃ (২) নূতন সমাজের সৃষ্টি সম্ভব একমাত্র নূতন ব্রাহ্মণের সৃষ্টি দিয়া—'।

(২) এখানে ফলতঃ নিয়ে মূলতঃ একটু গোলযোগ। নতুন সমাজের সৃষ্টি হ'তে পারে একমাত্র শূদ্রের দ্বারাই—তাদের নতুন সৃষ্টির দরকার নেই, দরকার শুধু তাদের নতুন দৃষ্টির। পৃথিবীর আদি সমাজ, আদি সভ্যতা কৃষকের লাঙলের ফালেই গড়ে' উঠেছিল ; আজ পর্য্যন্ত সভ্যতার যা খাঁটি সোণা তা উদ্ধার করচে শ্রমিকরাই, অবশ্য তাতে পালিশ করচে নলিনীবাবুর 'অভিজাত বর্ণত্রয়' এবং গিল্টিও চালাচ্চে তারাই। রাশিয়ার কথা ছেড়েই দিই, আমেরিকার নতুন সমাজ কাদের সৃষ্টি ? ইউরোপ থেকে যে-সব শূদ্রের দল আমেরিকায় চাষবাসের পত্তন করতে গেছল তাদের। আদি যুগের আর্য্যাবর্ত্তেরও সেই একই ইতিহাস। সমাজ-সৃষ্টির গোড়ায় থাকে শূদ্রের শক্তি—পরে সেই সমাজের শোষণ, শাসন এবং নিছক শোভাবর্দ্ধনের জন্য—যথাক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের

অথচ, নলিনীবাবু আরেক জায়গায় স্বীকার করেছেন—'বোলশেভিকরা তাহাদের রাষ্ট্রে তাহাদের সমাজে যে বিশেষ বিশেষ বিধি ব্যবস্থা নূতন প্রণয়ন করিতেছে···সে সমস্তই, হয়ত সামান্য অদল বদলের ফলে, আদর্শ সমাজের রাষ্ট্রের আদর্শ বিধি ব্যবস্থা হইয়া উঠিতে পারে।'

কিন্তু হ'লে কি হবে, সে সবই যে শূদ্রের সৃষ্টি! 'ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণদের' সঙ্গে পরামর্শ করে' এবং 'অভিজাত বর্ণত্রয়ের' সহায়তা নিয়ে যদি ক'রতো তাহলে নলিনীবাবুর আপত্তি ছিল না, কিন্তু নিজেরাই সব করে ফেলা—এ যে একেবারে হঠকারিতা! পণ্ডিচেরীর ব্রাহ্মণেরা (নতুন পেটেণ্ট) নতুন সমাজের সৃষ্টি করবেন বলে' বহুদিন থেকে হাত ধুয়ে বসে আছেন, তাঁরা কি করেচেন না করেচেন তা না দেখেই, তাঁদের উপদেশের অপেক্ষা মাত্র না করে'—এমন কি তাঁদের নোটিশ পর্য্যন্ত না দিয়ে, তাঁদের

উদয় হ'তে থাকে। সমাজের মতো বিরাট সৃষ্টি একমাত্র শূদ্রের দ্বারাই সম্ভব—ব্রাহ্মণের দ্বারা হ'তে পারে দু'একটা সঙ্ঘ আশ্রম বা আড্ডা—বড় জোর এক আধটা নৈমিষারণ্য বা পণ্ডিচেরী!

জগদুদ্ধারের একচেটে অধিকারে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়ের চূড়ান্ত হয়েচে। তারা একটা দুরপনেয় দুরপরাধ করে' ফেলেচে সন্দেহ নেই; ভরসা এই, নলিনীবাবু নিজগুণে তাদের ক্ষমা করবেন। তারা জানে না তারা কী করেচে!

অত্যন্ত অসহিষ্ণু তারা; কাল-রূপ অনন্ত ব্রহ্মের সঙ্গে চিরন্তন যোগ রক্ষা করবার মতো অগাধ আলস্যের তাদের অমার্জ্জনীয় অভাব,—ধৈর্য্য, সংযম, তিতিক্ষা তাদের একবিন্দু নেই; তারা ভাবচে দুনিয়ার লোকের উপকার করার মহা দায়িত্ব যেন তাদের ঘাড়েই অপেক্ষা করে' আছে—সেটা হট্ করে' করে'-ফেললেই হোলো! কিন্তু বাস্তবিকই তো তা আর নয়! মানুষের দুঃখ কষ্টে অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতে গেলেই কি আর সেটা টেঁকে?—তাতে অন্য সব সৃষ্টিকর্ত্তা বা সৃষ্টিকামীদের শুধু চিত্ত-চাঞ্চল্যই জাগে, তাঁদের তপোলব্ধ নিরবচ্ছিন্ন নির্ব্বিকার শান্তিরই শুধু বিঘ্ন ঘটানো হয়, তার বেশি কিছু নয়।

নলিনীবাবু তো স্পষ্টই বলে' দিচ্চেন—'অন্ত-রাত্মার হিসাব আগে না করিলে, বাস্তবের স্থূল-

রূপের আদি উৎপত্তি যে সূক্ষ্ম চিন্ময় লোকে সেখানে বীজ বপন না করিয়া আসিতে পারিলে, সকল শ্রম পণ্ড হইতে বাধ্য। জগতে যে দুঃখ দেখিয়া বুদ্ধদেব পথের ভিখারী হইয়া গিয়াছিলেন—সেই দুঃখ দূর করিয়া, দুঃখের সমাজকে সুখের সমাজে পরিণত করা কেবল জড়বুদ্ধির কাজ নয়, প্রয়োজন অন্যরকম সাধনার।···বোলশেভিকরা তাহাদের দেশের জন্য বা জগতের জন্য যে স্থায়ী সম্পদ কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিবে তাহা মনে হয় না—সে কর্ম্মের কৌশল তাহারা আয়ত্ব করিতে পারে নাই।'

আধুনিক শূদ্রদের স্পর্দ্ধা দেখ, তারা এ সব তত্ত্বকথা মানতে চায় না! হোক না কেন এই 'শূদ্রবর্ণা পৃথিবীতে' তাদের সংখ্যাই সাড়ে পনেরো আনা, তবু তো তারা সেই 'কৃষক আর মজুর'! অভিজাত অর্দ্ধ-আনাকে ছেঁটে ফেলে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করা কি তাদের কর্ত্তব্য হয়েচে? এতদিন এই 'অভিজাতদের' সুশাসনে তারা কেমন সুখে কালাতিপাত করেচে—তার বিনিময়ে এই! ভদ্র ভাষায় বলতে গেলে—তারা নেহাৎ ছোট লোক!

তারপরে 'চিন্ময় লোকে বীজ বপন' করা দূরে থাক,—এতকাল ধরে' 'চিন্ময় লোকে বীজ বপনের' ফলে যে-সব সনাতন শস্যে ধরিত্রী ভারাক্রান্ত, আগে কিনা তাদেরই কর্ত্তনে লেগেচে! আমাদের ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মচিন্তার সঙ্গে অর্থচিন্তার কী অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন—একদিকে যেমন উপনিষদ-গীতা, অন্যদিকে তেমনি মনুসংহিতা; একদিকে যেমন বড়ো বড়ো তত্ত্ব, অপরদিকে তেমনি ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে অন্নপ্রাশন থেকে সুরু করে' বেচারার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক ট্যাক্সো আদায়, এমন কি বহুকাল সে খতম হ'য়ে গেলেও তার পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে মড়া মাথার ওপর বংশানুক্রম জিজিয়া; তুগ্র্হ ক্রমে এই ভূ-গ্রহে জন্মাবার ও মরবার পাপের শাস্ত্রমত প্রায়-শ্চিত্ত—সেই যে আমাদের ছিল ভালো! বোল-শেভিক শূদ্ররা নিজের দেশের ব্রাহ্মণদের তো লোপ করেইছে; আমাদের ব্রাহ্মণদের এইসব সনাতন ব্যবসা, বিনা পুঁজির ফলাও করবার—এসবও লোপাট করবে নাকি? তাহলেই ত গেছি!

তারপর ক্ষত্রিয়। তারা কেমন দেশে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ ও অশান্তি বাধিয়ে রাখত—তাদের

নব নব কুরুক্ষেত্র পৃথিবীতে শূদ্রাধিক্যের কত বড়ো অমোঘ ঔষধ ছিল আর তাদেরই কিনা বিলোপ করা! কেউ হয় তো বলবেন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি যখন রইলই, তখন অস্ত্রচিকিৎসাটা উঠে গেলেও কিছু যায়-আসবে না। কিন্তু অমন দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়রা যখন গেল, তখন, শূদ্রদের অনাচারে, এই সব অভিজাত আধি-ব্যাধিরাও যে টিকে থাকতে পারবে, সে-ভরসা বড়ো নেই।

বেচারা বৈশ্যদের যা দুর্গতি করেচে, মনে করলেও কান্না আসে। অর্থ অনর্থের মূল—শূদ্রদের সেই অনর্থ থেকে রক্ষা করবার জন্য তারা কষ্ট করে' সেই অর্থভার এতদিন নিজেরা বহন করেচে; অবশ্য ভারমুক্ত হ'য়ে তারা বেঁচে গেছে,—কিন্তু এই ভাবে বাঁচানো! সম্পূর্ণ তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বে—এর চেয়ে না বাঁচানোই যে ভালো ছিল! শূদ্ররা যখন ধরিত্রীকে দোহন করে তখন কেউ একটি কথাও বলে না, কিন্তু বৈশ্যরা তাদের দোহন (exploit) করতে গেলেই কথা ওঠে! বৈশ্যরা শোষণ করবে, ক্ষত্রিয়রা শাসন করবে, আর ব্রাহ্মণেরা রকমফের করে' দুটোই করবে—এই অপূর্ব্ব 'সহযোগ ও সমবায়ের মধ্যে'

যে অভিজাত সমাজের ‘প্রাণ’ ছিল, সেখানে ‘দ্বন্দ্ব’ ও সন্দেহ আমদানি করে’ শূদ্রজাতরা কী সর্ব্বনাশই না করেচে!

মস্কোর কথা থাকুক, এখন পণ্ডিচেরীর দিকে তাকাই! সেখানকার ‘নতুন ব্রাহ্মণরা’ ‘চিন্ময় লোকে বীজ বপনে’ যেমন অত্যধিক সময় নিচ্চেন তাতে অজন্মার ভয় একেবারেই করিনে! রাশিয়ায় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করতে পারুন আর নাই পারুন, অন্তত এই দেবভূমি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের ত্র্যহস্পর্শ যদি কায়েম রাখতে পারেন তাহলেও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি! অন্তত আমরা তো রক্ষে পাই! আমরা অসহায় ভাবে তাঁদেরই মুখ চেয়ে রইলুম। বেটার্ লেট্, দ্যান্ নেভার!

অপ্রিয় সত্য ও প্রিয় অসত্য

সুভাষচন্দ্র যখন বলেছিলেন, পণ্ডিচেরীর চিন্তাধারার দ্বারা ভারতের কর্ম্মশক্তি অভিভূত হবার আশঙ্কা আছে, তখন কথাটা তিনি মুখ-রোচক করে' বলেননি, এই জন্যে তার ভেতরে অপ্রিয়তা অনেকখানি আছে। সুভাষ বাবুর বক্তব্যের প্রতি কথা বাদ দিয়ে প্রতিবাদ করতে পারি, কিন্তু তার ভেতরে যে-সত্য তাকে কিছুতেই বাদ দিতে পারিনে। সুভাষ বাবু সাহসভরে যে-কথাটা বলে' ফেলেচেন সেটা ভারতবর্ষে তাঁর একলারই ধারণা, এমন নাও হ'তে পারে ; এরূপ মতামত হয়তো আরো দু'চারজন দু'চারজনের কাছে প্রকাশ করে' থাকবেন ; কিন্তু সুভাষচন্দ্র যেখানে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলি বলেচেন—সেখান থেকে তা সবার কাণে গেছে ; সে-রকম ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, নীরব থাকলেই তাঁর অপরাধ হোতো।

সুভাষ বাবুর আশঙ্কা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ 'আত্মশক্তির' পৃষ্ঠায় নলিনী বাবুর গবেষণা—'তরুণের স্বদেশ সাধনা'। নেশন গড়া সম্বন্ধে তরুণের মনে অনেক আইডিয়া থাকতে পারে, কিন্তু নলিনী বাবু প্রবন্ধাকারে যা ব্যক্ত করচেন, তা যদি সত্যই এ দেশের তরুণদের আইডিয়া হোতো তাহলে অন্ততঃ আমি পঞ্চাশ-অর্দ্ধেই বানপ্রস্থে যেতুম! আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, এই আইডিয়া একমাত্র নলিনী বাবুর। তরুণের মাথার ওপর চারিদিক থেকে নানারকম চাপ পড়চে এ কথা জানি, কিন্তু তার ফলে মস্তিষ্ক ফেটে যে তার অপমৃত্যু ঘটেচে, এ দুঃসংবাদ এ পর্য্যন্ত আমি পাই নি।

নলিনী বাবু তাঁর প্রবন্ধে আমাদের অনেক রুচিকর কথা শুনিয়েচেন তার মধ্যে সত্য কতখানি তা যাচাই করার প্রয়োজন আছে। কেননা কবিতায় যখন প্রিয় কথা শুনি তখন তার প্রিয়ত্বই যথেষ্ট মনে করি, সত্য সেখানে বাহুল্য; কিন্তু নিছক গদ্যে নলিনী বাবু যে-বস্তুর অবতারণা করেচেন তাকেও সেই ভাবে গ্রহণ করলে তাঁর প্রতি যে-অবিচার করা হবে, তাঁর কঠোর

সমালোচনাও তার কাছে কিছু নয়। কাব্যলোকে ধোঁয়া উপভোগ করা চলে,—কিন্তু গৃহলোকে ধোঁয়া, কাঁদবার পক্ষে প্রকাণ্ড সহায় হ'লেও, বাঁচবার পক্ষে মোটেই নয়।

কার্ল্ মার্ক্স ইতিহাসের ইক্নমিক ব্যাখ্যা করেছিলেন; নলিনী বাবু এবার ইতিহাসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সুরু করেচেন। তিনি বলচেন—'জাপান যে রুশকে হটাইয়া দিয়াছিল, তাহা কতখানি ইউরোপীয় সাজসজ্জার জোরে, কতখানিই বা জাপানের প্রাচীন দীক্ষা, সনাতন ধর্ম্মের কল্যাণে ?···জাপান যে এত সহজে, এমন সম্পূর্ণ রূপে রুশের মত বিপুল বিভীষণ শক্তিকে ছত্রছন্ন করিয়া দিতে পারিয়াছিল তাহার মূল কারণ স্থূল অস্ত্রশস্ত্রের যথাযোগ্যতার মধ্যে ততখানি নাই, (১) সে কারণ আরও গভীরে,—বাহিরের ধর্ম্ম-জীবনের ক্ষেত্রে জাপান যে নামাইয়া আনিতে

(১) তাঁর এই মতবাদ কিরূপ মারাত্মক (অন্তত-পক্ষে হ'তে পারত) তা পাঠক বিবেচনা করুন। ভাগ্যিস্, আমরা নিরস্ত্র জাতি তাই রক্ষে! আসলে মামাই নেই তার আবার কাণা আর খোঁড়া! কিন্তু থাক্‌লে—?

পারিয়াছিল তাহার প্রাচীন অন্তরাত্মার ধর্ম্মের কিছু প্রভাব, এই জন্য।'

ভালো কথা, মেনে নিলুম, জাপানের জয়ের কারণ তার আধুনিকতা নয়, তায় 'প্রাচীন দীক্ষা ও সনাতন ধর্ম্ম'; কিন্তু আমাদের আর যাই থাক নাই থাক, ওই দুটি বস্তুর অভাব তো কোনো-দিনই ছিল না, তবে আমরাই বা কেন ইংরেজের মতো 'বিভীষণ শক্তির' সংঘর্ষে এমন কাবু হ'য়ে পড়লুম (২); জাপানের মতো তাদের 'ছত্রছন্ন' করে' দিতে পারলুম না?—আমাদের কপালেই বা, 'ভাগবত সত্ত্বার' এমন উল্টো বিচার কেন?

ধর্ম্ম ও দীক্ষা—এই দুটো বস্তুর যা কিছু প্রকাশ হবার তা যে প্রাচীন কালেই হ'য়ে গেছে—একথা আর যেই মানুক, পৃথিবীর তরুণরা যদি মানে তাহলে তার চেয়ে করুণ আর কিছু নেই। আধুনিক যুগের ধর্ম্ম ও দীক্ষা যদি প্রাচীন যুগের সঙ্গে না মেলে, সর্ব্বপ্রকারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়,—তাতে এই গ্রহের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসীদের অসম্মান হয়ত হবে, কিন্তু এই পৃথিবীতে আমাদের

(২) 'প্রাচীন দীক্ষা ও সনাতন ধর্ম্মের' কুম্ভকর্ণ-শক্তির ফলে নয়তো?

আসবার সম্মান এবং সার্থকতা সেইখানেই। অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎ বড়ো এ কথা তরুণেই বলে। এ কথা যদি না বলতো তাহলে যে বিপুল ট্রাজেডি ঘটতো তার ম্লান আলোকে ধরিত্রীর মুখ অত্যন্ত ম্রিয়মান দেখাতো।

নলিনী বাবুর দ্বিতীয় বাণী—'ইউরোপের আসুরিক শক্তিকে যদি জয় করিতে হয়, তবে তাহা সম্ভব দুই পথে। এক ইউরোপের অপেক্ষাও বৃহত্তর অসুর হইয়া—আর না হয়, সত্যকার দেবশক্তি অর্জ্জন করিয়া। প্রথম পথ দারুণ, দুর্গম—সংঘর্ষের সন্তাপের অজ্ঞানের অকল্যাণের বোলশেভিকরা জগৎকে এই পথে লইয়া যাইতে চাহিয়াছে। তাহা ছাড়া এসিয়ার পক্ষে এই পথ পরধর্ম্মের পথ।'

বোলশেভিকদের উপর, দেখচি, নলিনী বাবুর রাগ কিছুতেই পড়চে না,—সেবারে তিনি তাদের শূদ্র বলে'ই নিরস্ত ছিলেন, এবার একেবারে অসুর বানিয়ে ছেড়েচেন; এমনকি সেখানেই ক্ষান্ত হ'তে চাননি, একথাও বলেচেন যে তারা 'জগৎকে সংঘর্ষের সন্তাপের অজ্ঞানের অকল্যাণের পথে' নিয়ে যাচ্চে। অভিজাত অর্দ্ধ-আনা এতদিন

শূদ্র সাড়ে-পনের-আনার মাথায় হাত বুলিয়ে যেরূপ নিশ্চিন্ত আরামে কালাতিপাত করে' এসেচে তাতে আজ তাদের সেই বর্ণাশ্রমের নিরঙ্কুশ গণ্ডী থেকে সশ্রম মুক্তি দিতে গেলে সংঘর্ষ ও সন্তাপ কিছু ঘটবেই ;—কিন্তু ঝড় যেমন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম নয়, তেমনি এই সন্তাপও দুদিনের। বৈষম্যের প্রথম বিক্ষোভ কেটে যাবার পর যখন পরিপূর্ণ সাম্য বিরাজ করবে তখনকার লোকে সমাজের সেই অবস্থাকেই স্বাভাবিক বলে' মেনে নেবে (যেমন রাশিয়ায় নিয়েচে) ; 'আমার পূর্ব্ব পুরুষ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন বা দরজা-ভাঙ্গার মহারাজা ছিলেন !' —এমন ক্ষোভ কারু মনে জাগবে না। তারপর, বোলশেভিজম্ জগৎকে অজ্ঞান ও অকল্যাণের পথে নিয়ে যাচ্চে এ কথাই বা নলিনীবাবু বলচেন কেন ? এতদিন জগতের জ্ঞান ও কল্যাণ বলতে আমরা বুঝতুম জগতের বিশেষ বিশেষ দু'পাঁচ জন লোকের জ্ঞান ও কল্যাণ—আজ নির্ব্বিশেষ সকলের জ্ঞান ও কল্যাণের ব্যবস্থা হচ্চে বলেই কি নলিনী বাবু ওই শব্দ দুটির আভিধানিক অর্থ পালটে দিতে চান ?

সাম্যবাদকে যাঁরা রাশিয়ার আমদানি

ভারতের পক্ষে পরধর্ম্ম বলেন তাঁরা গোড়াতেই একটা ভুল করেন। বর্ণাশ্রম লোপ করে' বুদ্ধদেবের সাম্য স্থাপনের চেষ্টা তাঁরা প্রথমেই বিস্মৃত হন। অতীতের কথা ছেড়েই দিই, বর্ত্তমানে মুসলমানরাও যে ভারতের অধিবাসী, এবং তাদের মধ্যে সাম্যবাদ কোনো না কোনো রূপে অত্যন্ত সহজভাবে বিদ্যমান রয়েচে এ কথাও তাঁরা ভুলে যান। তারপর হিন্দুদের সনাতন যৌথ-পরিবার (৩)—তার ভেতরে আমরা কী দেখি?—কমিউনিজ্মের মূলসূত্র; সাধ্যমত উপার্জ্জন পরিবারে দেবে এবং প্রয়োজন মত তা থেকে নেবে। গৃহ থেকে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী থেকে গ্রামের মধ্যে এই কমিউনিজ্মের প্রাচীন রূপের একটা ক্রমবিকশিত প্রকাশ ঘটেছিল—আজ যদি তাকেই আধুনিক জীবনের ও সমস্যার উপযোগী করে' বৃহত্তর সমাজে (অর্থাৎ সমগ্র দেশের মধ্যে) রচনা করা যায় তাহলেই মহাভারত অশুদ্ধ হবে? বরং ইভোলিউশনের নিয়ম অনুসারে সেইটাই কি তার স্বাভাবিক পরিণতি নয়? বুদ্ধদেবের আমলে এই ভারতবর্ষেই যে-সাম্যবাদের প্রথম সূচনা

(৩) যদিও সেই একান্নবর্ত্তী পরিবার আজকাল ৫১-বর্ত্তী হ'য়ে দাঁড়িয়েচে!

হয়েছিল আজ যদি সেখানেই তার সফলতা ঘটে সেটাই কি তার 'স্বধর্ম্ম' হবে না ?

না হয় তর্কের খাতিরে ধরেই নিলুম, সমাজ তন্ত্রের রূপ সম্পূর্ণ বোলশেভিকি-সৃষ্টি ; তবু ভারত যদি নিজের প্রেরণায়, নিজের প্রয়োজনের তাগিদে ঐ রূপই গ্রহণ করে তাতে ভারতের বৈশিষ্ট্যই বা যাবে কেন (৪) এবং তাকে অনুকরণ মনে করে' আমরাই বা লজ্জিত হব কেন ? দুটো লোক যদি বিভিন্ন পথে গিয়ে এক লক্ষ্যে পৌঁছয় তাতে তাদের পরস্পরের কাছে খাটো হবার কারণ নেই। প্রাচীন যুগের জাতিরা পরস্পর নিরপেক্ষ থাকা সত্ত্বেও যেমন তাদের মধ্যে সনাতনতার একটা ঐক্য দেখতে পাই, এ যুগের জাতিদের আধুনিকতার মধ্যে তেমনি একটা ঐক্য থাকবে এইটাইত স্বাভাবিক।

নলিনী বাবুর মতে কিন্তু, ভারতের পথ একেবারেই আলাদা। দুনিয়ার আর সকলে যদি পরিপূর্ণ মানুষ হ'য়ে বাঁচতে চায় আমরা চাইব

(৪) যদিও আমি মনে করি বৈশিষ্ট্যের চেয়ে মানুষ বড়ো—বৈশিষ্ট্যের গোঁড়ামির পায়ে মানুষের কল্যাণের বলিদান, আর যে যুগেই চলে থাকুক, এ যুগে অচল।

দেবতা হ'তে কিম্বা অমানুষ থাকতে, অথবা এই রকম একটা ভাগাভাগি বন্দোবস্তে যে গুটিকত হবে দেবতা আর বাকি সব—সম্ভবত উপদেবতা! (৫) নলিনীবাবু সেই পথই আমাদের বাতলেচেন! তিনি বলচেন—'দ্বিতীয় পথ (অর্থাৎ দেবশক্তি অর্জ্জনের পথ) এশিয়ার—ভারতের নিজস্ব পথ, স্বধর্ম্মের পথ, পরম স্বস্তি পরম সিদ্ধি তাহাতে। ভারতের আদর্শ কর্ম্মী, বিভূতি যাঁহারা, যাঁহারাই অসুর রাক্ষসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহারা দেখি সকলে চিরকাল প্রথমে দেবশক্তির নিকট হইতে দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়া তবে রণক্ষেত্রে নামিয়াছেন। আসুরিক শক্তি দিয়া অসুরকে জয় করা—কখন সম্ভব হয় আবার কখন না'ও

(৫) কেননা আমার বিশ্বাস, দেবতা হওয়ার আর্ট-কে করতলামকলকবৎ করা দু'চারজনের পক্ষেই সম্ভব; বাকি সব হঠাৎ-দেবতা হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেও দেবত্বের লক্ষ্য ভেদ করতে পারবেন না, অথচ এই হঠযোগ-সাধনের ফলে যে-অবস্থায় উত্তীর্ণ হবেন তাকে মানুষী অবস্থা বলে' তাঁদের ও মানুষদের অপমান করাও সঙ্গত হবে না, এই বিবেচনা করে' তাঁদের more than man but less than God-এই আখ্যা দেওয়াই সমীচীন মনে করলুম।

হইতে পারে ;...কিন্তু দেবশক্তির দ্বারা অসুরের যে জয় তাহা অব্যর্থ তাহা সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত—এবং আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ভারত দেব-অংশ সম্ভূত।'

'দেবশক্তি অর্জ্জন' বলতে নলিনী বাবু যে কি বোঝেন এবং কি বোঝাতে চান তা তিনিই জানেন! কতজন লোকের পক্ষে দেবশক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব তিনি মনে করেন? পৃথিবীতে সম্প্রতি কজন দেবতা হয়েচেন এবং কজন হব-হব করচেন? তাঁদের কজনাকে বাদ দিয়ে তুনিয়ার বাকী দেড়শ' কোটি লোকের কী গতি? তারা কি দেবতাদের বাণী শুনে আর পদসেবা করেই কৃতার্থ হবে? তাদের যখন দেবত্ব প্রাপ্তির আশা নেই তখন কি মানুষের প্রাপ্য থেকেও তাদের বঞ্চিত থাক্‌তে হবে? তাদের জন্যে তাঁর কী ব্যবস্থা?

নলিনী বাবুর স্কুলের সঙ্গে লেনিনের স্কুলের তফাৎ এইখানে—নলিনী বাবুরা চোখের সামনে দেখেন তাঁরই সগোত্র তু-দশজন লোক; আর বোলশেভিকরা দেখে—পৃথিবীর সব মানুষকে। কাজেই একটা পথ যখন অন্দরের দিকে যায়,

আরেকটা তেমনি বিশ্বের দিকে বেরিয়ে পড়ে। বিশ্বপথের যারা যাত্রী, অন্দরের লোকদের তারা লক্ষ্যও করে না, আন্দরিকদের আন্তরিক দুঃখের কারণই এইখানে। এই জন্যই আন্দরিকরা বলেন—বাইরের পথটা কিছু না, অন্দরের পথই সত্য; কিন্তু ভরসা করে' সেই পথে সবাইকে নিমন্ত্রণ করতেও পারেন না; কেননা বিশ্বশুদ্ধ লোক চলতে পারে সে-পথ তত বড়ো নয়। বিশ্বশুদ্ধ লোক যে-পথের যাত্রী হ'তে পারে না সে পথ ব্যবহারের অযোগ্য—যে-মুক্তি একা আমার তার মতো করুণ প্রাপ্তি দুনিয়ায় আর নেই।

নলিনী বাবুর একটা আবিষ্কার কিন্তু খুব আশ্চর্য্য! তিনি বলেচেন—'ভারতের আদর্শকর্ম্মী, বিভূতি যাঁহারা, যাঁহারাই অসুর রাক্ষসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন তাঁহারা দেখি সকলে চিরকাল প্রথমে দেবশক্তির নিকট হইতে দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়া তবে রণক্ষেত্রে নামিয়াছেন।' রণক্ষেত্রে নেমেচেন তো বটে, কিন্তু একবারও যে জিতেচেন পুরাণ-ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই! অসুরের কাছে বারবার পরাজয়ই দেবতাদের দুর্ভাগ্য-লিপি! বোধহয় এই কারণেই, পণ্ডিচেরী দিব্য অস্ত্র লাভ

করেও মস্কোর অসুরদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে নামতে এত ইতস্তত করচেন ! তুরীয় লোকে দেবতারা সত্য হ'তে পারেন, কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে তথাকথিত অসুরেরা ততোধিক সত্য—তুরির সাহায্যে তাদের ওড়ানো যায় না ! এবং যদিও নলিনী বাবু বড়ো গলা করে' ঘোষণা করেচেন—'দেব-শক্তির দ্বারা অসুরের যে জয় তাহা অব্যর্থ, তাহা সম্পূর্ণ, চূড়ান্ত—এবং আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ ভারত দেব-অংশ সম্ভূত'—তবুও আমরা বিশেষ ভরসা পাচ্চিনে। কারণ আমরা যদি দেবতাদের এতই আত্মীয়, এতই আদরের, তবে, (৬) 'একবার পাঠানের, একবার মোগলের, একবার খৃষ্টানের পায়ে আমাদের মাথাই এমন করে' মুণ্ডিত হচ্চে কেন ?' যখন দেখচি সেই পৌরাণিক যুগ থেকে এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অসুরেরই একাধিপত্য ও বাড়বাড়ন্ত এবং বেচারা দেবতাদের প্রায় বংশ-লোপ, (৭) তখন কি করে' আর বিশ্বাস দৃঢ় রাখি যে দেবত্বটাই সত্য আর অসুরত্ব কিছু না ! বসুন্ধরাকে ভোগ-দখল করতে হ'লে যখন আসুরিক হওয়া ছাড়া

---

(৬) রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

(৭) তদা নাশংসে বিজয়ায় !

উপায় নেই, তখন তেমন মহাপাপ করার চেয়ে 'দেব-বংশসম্ভূত' হতভাগ্য আমরা, আমাদের দুর্লভ দেবত্ব বাঁচিয়ে শুভ দিন-ক্ষণ দেখে' ধরাধাম ছেড়ে বরং অমর্ত্ত্য লোকের দিকে যাত্রা করি! সেটা আমাদের পক্ষেও নিরাপদ এবং পৃথিবীর পক্ষেও!

আধুনিক বোলশেভিকদের পৌরাণিক গাল দেওয়ার সার্থকতা আমি বুঝিনে। বেশি পরিমাণে মানুষ হওয়ার জন্যই কি তারা অসুর? লেস্ দ্যান্ হিউম্যান্ হওয়াটাই কি দেবত্বের লক্ষণ? বোলশেভিকরা মানুষের দেহ ও মনের প্রয়োজনটা প্রথমে স্বীকার করে; এই জন্যই কি নলিনী বাবু তাদের অসুর বলতে চান? আর যেহেতু আমরা দেহকে তুচ্ছ করে' আত্মা-আত্মা-রবে আকাশ ফাটাই সেই কারণে আমরা দেবতা? দেহ যদি এতই অনাবশ্যক হয়, তাহলে এমন দেহ ত্যাগ করে' পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ হওয়াই আমাদের উচিত—তাতে দেহ ও আত্মা দুটোই মুক্তি পাবে এবং উভয়ের পক্ষেই সেটা ভালো।

আসলে, আত্মা হচ্চে দেহ-মনের সৃষ্টি। এই জন্যে বোলশেভিকরা দেহ-মনকে যদি আত্মার চেয়ে

বড়ো করে' থাকে নিতান্ত ভুল তারা করে নি। অন্তর্গত গ্ল্যাণ্ডের সিক্রিশান্ দ্বারা যেমন দেহের ভিতরে যৌবনের সঞ্চার ঘটে, তেমনি দেহ মন পরিপূর্ণ ও চরিতার্থ হ'লে তার অভ্যন্তরে যে ভাব-রস বিনিস্থত হয় তাকেই আমরা বলি আত্মা—সেই সহজ নিঃসরণের আনন্দবোধই আমাদের আত্মবোধ। আত্মার চেয়ে আত্ম-প্রকাশ বড়ো, যেমন সূর্য্যের চেয়ে সূর্য্যের আলো। দেহ-মন সম্পূর্ণ ও সার্থক হ'লে আত্মার প্রকাশ সেখানে আপনিই হয়, কারু সাধাসাধির অপেক্ষা রাখে না; অতএব যেটা গোড়ার কাজ বোলশেভিকরা সেটাই যদি গোড়ায় করে' থাকে সেজন্য তারা অনাত্ম নয়, অনাত্মীয় তো নয়ই—এবং আত্ম-বিরোধী তাদের কিছুতেই বলতে পারিনে।

অবশেষে নলিনী বাবুর শেষ কথাটি বলে' আমার কথা শেষ করি। তিনি এই প্রিয় সংবাদটি আমাদের দিয়েচেন—'আজ বিশ্বমাতা ভারতশক্তি রূপে প্রকট হইয়া উঠিতেছেন সমস্ত জগতে নূতন একটা জীবন, উর্দ্ধতর একটা চেতনা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, পৃথিবীতে অভিনব সমাজ স্থাপন করিতে।'

বিশ্বমাতার প্রিয় পুত্র আমরা, জগতের উদ্ধারের যা কিছু কাজ তা আমাদের দ্বারাই তিনি সম্পন্ন করবেন,—আমরা সব চেয়ে বড়ো, সব থেকে বিশিষ্ট—এই সব কথা ভাবতে ভারি আরাম; সেই আরামের মধুচক্রে ঘা দিতে স্বভাবতই সঙ্কোচ হয়, কেননা মধু-র ভাগ্য সেখানে নেই, হুলের তাড়না যথেষ্ট। এই দুর্ভাগা দেশে প্রিয় অসত্যই নিরাপদ, অপ্রিয় সত্য বলা এখানে বাহবা পাবার পথ নয়; তবু এ কথা বলতেই হবে যে এই বৃথা গর্ব্ব, এই অলস আত্মপ্রসাদ, এই মারাত্মক মোহ থেকে মুক্ত হওয়া আজকের একান্ত প্রয়োজন।

নলিনী বাবুকে আমি এই কটি প্রশ্ন করি, বিশ্বমাতার এবম্বিধ বাসনার কথা তো বহুদিন থেকেই শোনা যাচ্চে, তবু তাঁর প্রকট হ'তে এত দেরি কেন? সেজে গুজে আসতেই বিলম্ব হচ্চে অথবা বিশ্বপিতার সঙ্গে দাম্পত্য কলহের ফলেই এই লঘুক্রিয়া? তারপরে, এত দেশ থাকতে ভারতবর্ষের ওপরেই তাঁর এ রকম পক্ষপাতিতা কেন? আর সব দেশ কি ভেসে এসেচে? এবং রাশিয়ায় ইতিমধ্যেই যে-অভিনব সমাজ স্থাপিত

হয়েচে, তাতে যে নলিনী বাবুর বিশ্বমাতার হাত নেই তাই বা তিনি জানলেন কি করে’ ? সেখানে কি বিশ্বমাতা প্রকট হ’তে পারেন না ? বিশ্বমাতা একমাত্র ভারতেরই অন্তঃপুরবর্ত্তিনী কিনা দয়া করে’ এ সংবাদটাও তিনি আমাদের দেবেন !— ভারতের অন্তঃপুর ব্যতিরেকে বিশ্বপথে তাঁর গতিবিধি নেই এটা নিশ্চিত রূপে জানতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত রূপে ঘুমোতে পারি।

সর্ব্বশেষে আমি এই বলতে চাই যে আজকের তরুণকে সর্ব্বতোভাবে আধুনিক হ’তে হবে ; তার মধ্যে যতটুকুতে প্রাচীনতা ঘটবে ততটুকুতেই হবে মৃত্যুর অধিকার। বার্দ্ধক্য ভালো, কিন্তু যৌবনের চেয়ে ভালো নয় ; কেননা তা সৃষ্টি-শক্তিকে বন্ধ্যা ও দৃষ্টি-শক্তিকে আচ্ছন্ন করে। নদীর পক্ষে নিত্যকার জল-ধারাই সত্য, প্রত্যহের সূর্য্যকর থেকে তার যোগান চলে ; তার দুই কূলে যে সনাতন বালু মোহ বিস্তার করেচে, আত্মহারা হ’য়ে তার মধ্যে আশ্রয় নিলেই তার মৃত্যু—এই প্রাচীন বালুকে প্রতি মুহূর্ত্তে অস্বীকার ও অতিক্রম করে’ এগিয়ে যাওয়াতেই তার নিরবচ্ছিন্ন জীবন। বালুকার প্রাচীনতা সে মানতে পারে, তার শাশ্বত

স্থাবরত্বকেও দূর থেকে নমস্কার করা চলে, কিন্তু তার খাতিরে নিজের জীবনের পরাভব কিছুতেই নয়।

আজকের তরুণের কর্ত্তব্য, বিশ্বমাতার জন্যে অপেক্ষা করা নয়, তাঁর দায়িত্বভার নিজের কাঁধে নেওয়া; অভিনব সমাজ স্থাপন করাই আজকের তরুণের সাধনা। এর জন্য যদি সংঘর্ষ বাধে, সন্তাপ জাগে, তার আঘাত তার আঁচ থেকে পিছিয়ে থাকা তাদের চলবে না। এর থেকে আত্মরক্ষার লোভে যাঁরা কর্ম্মস্থল ছেড়ে মর্ম্মস্থলে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক চিন্ময়-লোকে বীজ বপন কার্য্যই নিরাপদ মনে করবেন। তাঁদের ভাগবত-বুদ্ধির প্রশংসা করে' মৃন্ময়-লোকে যে-কাজ আজ অত্যন্ত আবশ্যক হ'য়ে পড়েচে তাতেই তাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে—তা হচ্চে আজকের জগৎ থেকে অতীতের বীজ সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট করা; কেননা এই বিনাশের দ্বারাই অতীত বর্ত্তমানের ক্ষেত্রে ফলবান হবে। বীজের বিলুপ্তি বনস্পতির অঙ্কুরতার পক্ষে যেমন প্রয়োজন, অতীতের বিলুপ্তি বর্ত্তমানের সার্থকতার পক্ষে ঠিক তেমনি; প্রাচীন সমাজের নিশ্চিহ্ন বিলোপ না ঘটলে নতুন সমাজের সৃষ্টি সম্ভব নয়।

দো রোখা !

এবার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র রায় ও শচীন সেন !(১) দুর্দ্ধর্ষ বলশেভিকদের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত নলিনী গুপ্ত মহাশয় এতদিন একা একরোখা লড়ে' এসে অবশেষে শ্রান্ত হ'য়ে নিরস্ত হয়েচেন—এবার রুখেচেন এঁরা দুজন ! এবার আর রক্ষে নেই, কেননা নলিনী বাবুর মতো এঁরাও বলশেভিকদের প্রতি এঁদের অন্তরের অমার্জ্জনা যে-ভাবে অমার্জ্জিত ভাষায় প্রকাশ করতে সুরু করেচেন, তাতে, তারা যদি ভদ্রলোক হয় পৃথিবী থেকে মানে মানে বিদায় নেবেই। তবে তারা কি—, কিন্তু সে প্রশ্ন থাক্।

মহেন্দ্র বাবুর রায় এই যে, 'বলশেভিক সমাজ মানুষের জীবনকে বন্য-পশু-জীবনেরই একটা

(১) 'আত্মশক্তি' চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়ের 'বলশেভিক গণমানব' এবং ১৩৩৬ সালের বোশেখের বিচিত্রায় শ্রীযুক্ত শচীন সেনের 'সোশ্যালিজ ম্'—দ্রষ্টব্য।

সঙ্ঘবদ্ধ রূপ দান করিতে চাহিতেছে'। বন্য-পশুদের মহেন্দ্র বাবু অনায়াসেই অপমান করতে পারেন, কেননা তার জন্য সভ্য পশুদের আদালতে বা আন্তর্জ্জাতিক দরবারে তারা মানহানির অভিযোগ আনতে যাবে না। কিন্তু তাদের তরফ থেকে আপত্তি এই ওঠে যে, 'আহার নিদ্রা ও ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির' ব্যাপারে মানুষের সঙ্গে তাদের নিবিড় ঐক্য থাকলেও বিচ্ছেদ এইখানে যে এখনো তারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে পরস্পরকে সভ্য প্রথায় উচ্ছেদ করতে শেখেনি। অতএব, মহেন্দ্র বাবু কি তাঁর ড্যামেজিং রিমার্কের জন্য পশুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন?

মহেন্দ্র বাবু বলেচেন, 'বলশেভিক গণমানব সকল মানুষকে তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্তর হইতে নামাইয়া আনিতে চায়।' অবশ্য 'এটা তাঁর মনে হয়।' কিন্তু মনে হওয়ার চেয়ে বড়ো সত্য যখন আর নেই এবং তার ওপরে যে-কোনো তত্ত্ব যখন নির্ব্বিবাদে খাড়া করা চলে তখন আমাদের মেনে নেওয়া ছাড়া পথ নেই। 'বল-শেভিক গণমানবের' বিরুদ্ধে মানুষকে পশুতে পরিণত করবার অভিযোগ এই জন্যে যে,

লেখকের মতে তারা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বাধা স্মৃষ্টি করচে। 'ভগবান নাই, আত্মা নাই, মৃত্যুর পরে সত্বার কোনো পরিণতি নাই, অতীন্দ্রিয় কোনো রহস্যলোকের আকর্ষণ নাই—'বলশেভিকদের এতগুলি 'নাই';—মহেন্দ্র বাবু বলতে চেয়েচেন এই বিরাট নাস্তিক্যের ভারেই পাশবিক সোভিয়েট রাজ্যে ব্যক্তিত্ব-বিকাশ মারা যাচ্ছে।

হায় হায়, এতদিন ধরে' 'ভগবান, আত্মা, মৃত্যুর পরে সত্বা, এবং অতীন্দ্রিয় রহস্যলোক' এরা সবাই সমবেত ভাবে বর্ত্তমান থেকেও পৃথিবীর ইতিহাসে যে-কটি ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয়েচে তাদের আঙুলে গোণা যায়—এখন এ সবও যদি লোপ পায়, জগতের তবে উপায়?

আমি বলব, এ পর্য্যন্ত কোটী কোটী মানুষ জন্মেচে যারা ব্যক্তিত্ব বিকাশ করে' যেতে পারে নি সে-ক্ষতিও যদি ধরিত্রীর সয়ে' থাকে, তখন আরো কয়েকজনেরও যদি সেই গতিই হয় সে তো বোঝার পরে শাকের আঁটি! অবশ্য ভগবান, আত্মা—এরা ব্যক্তি নয় এবং ব্যক্ত নয়, কিন্তু না হোক্, মহেন্দ্র বাবুর মতে, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের এরাই পরম সহায়। তাই-ই তো হবে, কেননা

স্বর্গ-সৃষ্টি করতে যে-বস্তুর দরকার সব চেয়ে বেশি তা হচ্চে উপসর্গ।

কিন্তু সত্যই কি কমিউনিজ্‌ম্‌ ব্যক্তিত্বের পক্ষে বাধা? ব্যক্তিত্ব-বিকাশের গোড়ার কথা ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য, তা নইলে সে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে না। মানুষ যখন দরিদ্র, আর্থিক জীবনেই হোক্, আর আত্মিক জীবনেই হোক্, তখন তার কোনো ছন্দ নেই, তখন সে ছন্নছাড়া। অন্নচিন্তা এবং অর্থ-চিন্তা মানুষকে এমন চমৎকৃত করে' রেখেচে যে বাইরের তাল সামলাতে গিয়ে অন্তরের তালা খোলার সময় সে পায় না। আত্মিক দারিদ্র্য দূর করবার দায়িত্ব কমিউনিজ্‌মের নয়, আর্থিক দারিদ্র্য দূর করাই তার কাজ। অর্থলোকে সে আনতে চায় স্বাচ্ছন্দ্য, অন্তর্লোক স্বচ্ছন্দ হবে তার ফলেই। কেবল দু'এক জন নয়, নিখিল ব্যক্তি নিজেকে ব্যক্ত করবার সুযোগ পাবে সেই পথে।

কমিউনিজ্‌ম্‌ মানুষের যে-মুক্তি এনেচে তা হচ্চে সশ্রম মুক্তি। সবাকার অন্ন সে যোগাবে, কিন্তু তার জন্য সবাইকেই খাটতে হবে। এখন, পৃথিবীতে এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন যাঁরা শ্রম

করতে নিতান্তই নারাজ—এইটেই তাঁদের ব্যক্তিত্ব বোধ হয়। এঁরা তথাকথিত ইনটেলেক্‌চুয়াল্‌স্‌; কমিউনিজ্‌মের বিরুদ্ধে এঁদের মিউচুয়াল্‌ কলরব এই যে, ব্যক্তিত্ব এতই ঠুনকো জিনিষ যে খাটালে মারা যায়। শ্রমে তার মূর্ত্তি নেই, আলস্যেই তার স্ফূর্ত্তি; তাকে খাটানো নয়, তার জন্যে খাট্‌ আনো।

কেউ-তাঁরা বলবেন যে দৈহিক শ্রমে বাধা নেই, কিন্তু বাধ্যতামূলক হ'লেই হয় ব্যক্তির অপমান। দৈনিক ক্ষুধার দ্বারা বাধ্য হ'য়ে আমরা ডান হাতের পরিশ্রম করি, এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার; তেমনি সামাজিক ক্ষুধার দ্বারা বাধ্য হ'য়ে যদি আমরা দুই হাতে পরিশ্রম করি সেইটাই হবে অপমান? ক্ষুধা উচ্চ বস্তু না হ'তে পারে কিন্তু তুচ্ছ বস্তু নয়—ক্ষুধার দাবীই সুধার অধিকারকে টেনে আনে।

দিন ছ ঘণ্টা ষ্টেটের জন্য খেটে দিয়েই আমি খালাস, বাকি আঠারো ঘণ্টা আমার ব্যক্তিত্ব-সাধনার পক্ষে যথেষ্ট। সেই ব্যক্তিগত সাধনার ক্ষেত্রে ষ্টেট্‌ আমাকে ডিক্‌টেট্‌ করতে আসে না। কিন্তু বুদ্ধিজীবিরা বলবেন, না আসুক,

দেহ খাটালে আমাদের আত্মা খাটো হয় এই সাফ্ কথা। তাঁরা শাস্ত্র পুঁথি খুলে' তত্ত্বকথা শোনান; আমরা ভাবি, এমনিই বুঝি। কিন্তু হায়, দৈনিক ছ ঘণ্টা করে' আমরা ঘুমোই এবং সেটা দৈহিক নিদ্রা—কিন্তু তাতে আমাদের ব্যক্তিত্বের বা চিত্তের বিকাশ রুদ্ধ হয় না। কেবল দৈহিক শ্রম করলেই আত্মার মাথা কাটা যায়!

তারপর বিচিত্রার পাতায় আসা যাক; এখানে সোস্যালিজ্‌মের যে-খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়েচে তাও কম বিচিত্র নয়! শ্রীযুক্ত শচীন সেন যে such insane হ'তে পারেন, এই প্রবন্ধটি পড়ার আগে তা বিশ্বাস করা শক্ত ছিল। এমন পাকা রকমের কাঁচা লেখা সচরাচর চোখে পড়ে না। এত উল্টো পাল্টা কথা এর মধ্যে যে জবাব দেব কি, তা জীর্ণ করাই কঠিন। বকুনি দেবার সুবিধা হবে বলে' লেখক মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের বুক্‌নি ঝেড়েচেন, কিন্তু তিনি এ কথা ভুলে গেচেন যে সম্প্রতি পৃথিবীতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যে-কটি মাথা, তাঁরা সোস্যালিজ্‌ম্‌কে সাদরে অভ্যর্থনা করেচেন; রবীন্দ্রনাথ সেই দলে নন্ এই দুষ্কল্পনা করে' শচীন

বাবু রবীন্দ্রনাথের অপমান করেচেন, এবং সম্ভবত নিজেরও সম্মান বাড়াননি।

শচীন বাবুর প্রবন্ধ থেকে পঙ্কোদ্ধার করা শক্ত ব্যাপার, সে-চেষ্টা আমি করব না। বিস্তর বাগ্-বিস্তারের ভেতর থেকে তাঁর যে-তিনটি বক্তব্য আমি আবিষ্কার করতে পেরেচি কেবল তারই জবাব দেব। শচীন বাবুর কাছে সব চেয়ে বড়ো 'সমস্যা' এই হয়েচে যে, 'সব ধর্ম্মগ্রন্থ সোস্যালিজম্ প্রচার করে না' এবং 'সব বড় লোক সোস্যালিষ্ট্ নয়।' অতএব এই জন্যই এ-বস্তু অগ্রাহ্য, এই কথা তিনি বল্‌তে চেয়েছেন।

ধর্ম্মগ্রন্থ কেন সাম্যবাদ প্রচার করে না তার কারণ এই যে সমাজের উচ্চস্তরের স্বার্থরক্ষার জন্যই তার সৃষ্টি ; কেবল নিজেই একাজে নিযুক্ত নয়, ভগবান, আত্মা, পরলোক, কর্ম্মফল ইত্যাদি মামুলি তত্ত্বকেও বড়ো লোকদের স্বার্থ-সাধনের এই কাজে সে লাগিয়েচে। কয়েকজনের সুবিধার জন্য অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছায় নিজের প্রাপ্যগণ্ডা থেকে বঞ্চিত থাক্‌বার প্রেরণা পাবে, যে-শাস্ত্র এমন প্রোপাগাণ্ডা করতে পারে তারই নাম ধর্ম্মগ্রন্থ। বস্তুত বলতে গেলে, ধর্ম্মগ্রন্থও এক

প্রকার ক্যাপিটাল, এ-কে খাটিয়ে খাওয়া চলে, ভাঙ্গিয়েও কিছুদিন বেশ যায়,—কিন্তু মেরে খাওয়া চলে না। আর মহাপুরুষরা যে সোশিয়ালিষ্ট্ নন্, তার কারণ বোধ হয় এই যে, এ পথ তত করতালিমুখর নয়। কেবল দিতে জানলেই সোশ্যালিষ্ট্ হয় না, নিতে জানাও চাই্। মানুষের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেই মহাপুরুষ হওয়া যায়, কিন্তু সোশ্যালিষ্ট্ হ'তে হ'লে তার চেয়ে শক্ত ষ্টাফ্ দরকার। দরিদ্রকে যে নারায়ণ বলে সেই মহাপুরুষ, কিন্তু তার নারায়ণত্ব থেকে যে তাকে চিরবঞ্চিত করে সে-ই সোশ্যালিষ্ট্।

শচীন বাবুর দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য হচ্ছে অর্থনীতিক। তিনি অনেক আগড়ম্ বাগড়ম্ বলেচেন, তার প্রতিকথা বাদ দিয়ে প্রতিবাদ্য এই কথা পাওয়া গেল—'কাঞ্চন বণ্টনের চেয়ে কাঞ্চন বাড়ানো ঢের শ্রেয়।' শচীন বাবুর মন অর্থনীতির পুরাণো সূত্রে আবদ্ধ, আধুনিক কালে এ ক্ষেত্রে যে-নূতন সূত্রপাত হয়েচে তাকে আমল দিতে তিনি রাজি নন্। আধুনিক তথ্য এই যে, বণ্টন করেই প্রকৃত পক্ষে বাড়ানো যায় তাতে হয় কাঞ্চনের প্রসার, তা ছাড়া অন্য ভাবে বাড়াতে

গেলে যা হয় তাকে বলে পুঁজি, তারই নাম প্রপার্টি ; জনকতকের প্রপার্টির সঙ্গে বাদ বাকি সকলের পভার্টি বেড়েই চলে—এর ছুটোই হচ্চে ক্রাইম্। এই ক্রাইম্ দূর করতে চায় সোশ্যালিষ্ট্, কেবল দরিদ্রকে raise করে’ নয়, ধনীদের erase করে’।

ধর্ম্মনীতি গেল, অর্থনীতি গেল, এখন রইল শচীন বাবুর তিন নম্বর আপত্তি। তা হচ্চে কমিউনিষ্টদের কর্ম্মনীতি নিয়ে। তারা ধীরে-সুস্থে কিছু করতে চায় না, তারা র‍্যাডিক্যাল্, ইভোলিউশনের চাকার দূর-বিপাক দূর করে’ ক্ষিপ্রপাক দিলে যা হয় সেই রিভোলিউশনের তারা পক্ষপাতী। আসলে, যারা নতুন পথ কাটে তারাই র‍্যাডিক্যাল্,—তাদের হচ্চে নির্ব্বিচার। পথের বাধা তাদের কেটে সাফ্ করতে হয়, ছোটো ছোটো কাঁটা-গাছ যেমন কাটা পড়ে, বড়ো বড়ো মহীরুহেরও সেই এক গতি। কেউ হয়ত বলবেন, এ সব বনস্পতি বহুদিনের, এরা সনাতন, অনেককে ছায়া দিয়েচে, আশ্রয় দিয়েচে ; কিন্তু তার মায়া করলে চলে না। কেননা মানুষ যে অচল হোলো তার পথ চাই আগে।

আজ এবং আগামী কাল।

একদল যখন পথ কাটে আর একদল দেয় বাধা, তখনি বাধে লড়াই। তারই নাম ক্লাস-ওয়ার—এ থেকে নিষ্কৃতি নেই। যতদিন পথ শেষ না হয় ততদিন লড়াই শেষ হয় না। কিন্তু পথের বিপক্ষে যারা, তাদের হট্‌তে হবেই—চিরদিনই হট্‌তে হয়েচে; তারপর যারা সেই পথে চলবে তারা শ্রেণীযুদ্ধ করে' চলবে না, চলবে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে। এই জন্যই আজকের-লেনিনের মুখে যুদ্ধের শ্লোগান্, সে হাঁকচে—Turn to the right and attack। কিন্তু কালকের লেনিনের মুখে কেবল প্রেমের গান!—তাকে লেনিন বলে' চেনাই যায় না!

শচীন বাবুর প্রবন্ধের আশ্চর্য্যলোকে একটি চমৎকার বাক্য পেলাম, তিনি বলেচেন, 'মানব-জাতির ওপর শ্রদ্ধা আছে বলেই আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে, এই বিরাট মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে মানবজাতির ওপর।' তিনি দু' চারজন সুপারম্যানের ওপর সমস্ত মানুষের ভবিষ্যতের বোঝা চাপাতে চান। বোঝা গেল, মানবজাতি বলতে তিনি দু'চারজন ভাগ্যবান মানুষকে বোঝেন; মানবজাতির ওপর

তাঁর এই অসাধারণ শ্রদ্ধার জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ !

মানবজাতির প্রতি শ্রদ্ধা আমারো আছে, কিন্তু আমি মনে করি মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করচে মানবজাতিরই ওপর। সুপারম্যান্ হচ্চে সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা, তার অবনতির মূর্ত্ত প্রতীক। তত্ত্বকথার ছলেই হোক আর অস্ত্র-শস্ত্রের বলেই হোক, সমস্ত মানুষকে নিল্‌ডাউন্ করে' রেখে নিজের উচ্চতা প্রদর্শনের প্রয়োগ-নৈপুণ্য যাদের তারাই সুপারম্যান্। কিন্তু মানুষের এই স্পেসিস্-এর লোপ আসন্ন হ'য়ে এসেচে, শীঘ্রই এরা মিসিং-লিংক্-এ পরিণত হবে। সমস্ত মানুষ সোজা হ'য়ে দাঁড়ালে কারু মাথা কারুকে ছাড়িয়ে ওঠে না। সোশ্যালিজ্‌ম্ চায় সমস্ত মানুষকে সম্পূর্ণ করতে—সুপারম্যানের এক্‌জিবিশন্ খুলতে নয়।

সব শেষে মহেন্দ্র বাবুর একটি কথা নিয়ে আলোচনা করব। তিনি বলেচেন, 'বলশেভিক গণমানবের জীবনে কোনো পরমনীতি নাই।'

অপরকে শোষণ করে' কি ভাবে নিজেকে পোষণ করা যায় তারই উপায় বাৎলে দেয়

অর্থনীতি, এবং এই দুষ্কর্ম্মের চক্ষুলজ্জা থেকে যা বাঁচায় তারই নাম ধর্ম্মনীতি—কাজেই মহেন্দ্র বাবুর সগোত্রদের পেটেণ্ট-করা 'পরমনীতি', 'পরম উদ্দেশ্য', এবং 'সনাতন পরিণতি'র প্রতি এতদিনের প্রতারিত ও 'পরিণত' গণমানবের যদি কিছুমাত্র আস্থা ও উৎসাহ না থেকে থাকে তাতে তাদের দোষ দিতে পারিনে। যে-পরমনীতি এতদিন তাদের দাবিয়ে এসেচে আজ মাথা তুলে তাকেই দাবানো যদি তাদের প্রথম নীতি হয় আমি আশ্চর্য্য হব না। কেননা নীতির চেয়ে মানুষ বড়ো। মানুষই নীতি গড়ে, নীতির মানুষ গড়বার সাধ্য নেই; এবং নীতি ভাঙ্‌তে পারে ব'লে'ই মানুষ মানুষ।

তবু কমিউনিষ্টদের জীবনে পরম না হোক্, একটা চরম নীতি আছে তা হচ্চে—All for one and one for all; প্রত্যেককে পূর্ণ করে' প্রত্যেকের সম্পূর্ণতা। এই নীতি তারা কোনো পুঁথির পাতায় লিপিবদ্ধ করে' রাখে নি, তাদের জীবনে একে রচনা করেচে। পুঁথি পড়ে' বা পুঁথিপড়া বিদ্যায় কমিউনিজম্‌কে বোঝা শক্ত, বই পড়ে' তার অতীতের ইতিহাস পেতে পারি,

কিন্তু তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা জানতে পারিনে। কেননা এ হচ্চে জীবনের প্রকাশ—বনস্পতির মতোই প্রাণবান; এর মধ্যে সনাতন কিছু নেই, এ প্রত্যহের, প্রতি মুহূর্ত্তের; এ বেড়ে চলেচে, বিচিত্র ক্ষেত্রে এর অঙ্কুরতা, বিচিত্র অঙ্কুরে এর সফলতা।

মানুষের সভ্যতার এতদিনের ইতিহাসে আমরা দেখি ছ'দল মানুষ। এক দল অখণ্ড স্বার্থপরতার ঘোষণা করে' বলেচে—পৃথিবীর সবাই আমার জন্য। ষ্টেট্—সে তো আমি! আমি চরিতার্থ হবো সেই তো পৃথিবীর বড়ো কথা। আরেক দল এদের প্রায়শ্চিত্ত করেচে বনবাসে অথবা ক্রুশকাঠে; তারা বলেচে, আমি এসেচি পৃথিবীর সকলের জন্য; সকলের কাছে আমি নিজেকে দিয়ে গেলাম।—এদের ছ'দলই সভ্যতার অসম্পূর্ণতার পরিচয় দেয়।

কেবল প্রকাণ্ড দেশে নয়, ছোটো ছোটো গ্রামে ছোটো ছোটো গোষ্ঠীর মধ্যেও এই ছুদল লোক আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রয়েচে,—একদলের নিষ্ঠুর লোভ, আরেকদলের নির্ব্বিচার ত্যাগ। বুদ্ধ ও যীশু চলে গেছেন, এক আধজন নয়, লক্ষ

লক্ষ বুদ্ধ ও যীশু আত্মদান করেচেন তার ইতিহাস রচিত হয়নি ; কিন্তু মানুষের সভ্যতা আজো অসম্পূর্ণ রয়েচে।

এই সভ্যতাকে সম্পূর্ণ করেছে কমিউনিজ্‌ম্‌—এর চিরন্তন দ্বন্দ্ব এ মিটিয়েচে। একরোখা সভ্যতাকে এ দো-রোখা করেচে, এর মধ্যে সামঞ্জস্য ও শ্রী এনেচে। কম্যুনিষ্ট বলে না যে আমি সবার জন্যে, কিম্বা আমার জন্যে সবাই ; তার বাণী হচ্চে আমি যেমন সবার জন্যে তেমনি আমার জন্যে সবাই। এই-ই কমিউনিজ্‌মের মূলনীতি—মানুষকে এ মুক্তি দিয়েচে নিরর্থ সঞ্চয় থেকে ও নিষ্ফল আত্মদান থেকে। স্বার্থত্যাগের বাণী এর নয়, এ বলেচে স্বার্থ-যোগ করতে, একের স্বার্থের সঙ্গে সকলের স্বার্থের। অবশ্য কতকগুলো মানুষের বুদ্ধ বা যীশুর মতো মহাপুরুষ হবার পথে এ কাঁটা দিয়েচে, কিন্তু তেমনি অধিকাংশ মানুষকে তুচ্ছতা থেকে বিমুক্ত করেচে। স্বার্থকে মহত্ত্ব দান করেচে এ। আমি দিচ্চি অথচ আমিই ফিরে পাচ্চি।—এ যেন সমস্ত মানুষের প্রতি সমস্ত মানুষের চুম্বনদান—এখানে দেওয়ার সঙ্গেই ফিরে পাওয়া যায়।

ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্ততা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র রায় দ্বিতীয় পর্ব্বে (১) এসেচেন, কিন্তু সেটা তাঁর শান্তিপর্ব্ব নয়। বলশেভিক গণমানবদের ব্যাভারে তিনি যেরূপ অশান্তি ভোগ করচেন তাতে তাদের পার্ব্বণে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণে যাঁরা যোগ দিয়েচেন, তাঁদের সম্বন্ধে চটে' এই রায় তিনি দিয়েচেন, যে, সহজ মনোবৃত্তির বশে সাময়িক ভাবের বন্যায় গা ভাসিয়েচেন তাঁরা।

মহেন্দ্র বাবুর যদি যোগ দেবার ক্ষমতা না থাকে তবে বলব সেটা তাঁর গুণ; কিন্তু 'সহজ মনোবৃত্তির' তাঁর যে-ধারণা তা ঠিক নয়। সভ্যতার ইতিহাসে যখনি কোনো নতুন পথের আবিষ্কার হয়েচে তখন অল্প কয়েকজনই সে-পথে পা বাড়িয়েচে, তারাই বলেচে এই পথ আমাদের

(১) বলশেভিক গণমানব, ২য় পর্ব্ব,—নবশক্তি, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬।

দেবে দূর-গতি ; কিন্তু অধিকাংশ লোকই কেবল পা গুটিয়ে বসেনি, পিছন ফিরে বসেচে—মহেন্দ্র বাবুদের মতো তাদেরো কোলাহল ছিল যে এর পরিণাম দূর-গতি নয়, দুর্গতি। এবং তাইই হচ্চে সহজ ও স্বাভাবিক মনোবৃত্তি।

বহুদিনের ও বহু জনের অন্তর্গূঢ় তাপে ও সন্তাপে অচল হিমাদ্রির বক্ষ বিদীর্ণ হ'য়ে, সাম্য-বাদের যে ক্ষীণ ধারাটি খুব সম্প্রতি এই দেশের বুকে নেমে এসেচে তাকে বন্যা বলা চলে না কিছু-তেই ; এবং তার নিঃশব্দ আবেদনে সাড়া দিয়েচে যত জন, তাকে সশব্দ আলোড়নে তাড়া করেচে তার ঢের বেশি।

কিন্তু তবু এ একদিন বন্যার আকার ধারণ করবেই। কেন ? তার কারণ মহেন্দ্র বাবু যদি ভেবে না পেয়ে থাকেন যিনি ভেবে পেয়েচেন তাঁর কথাতেই বলি ঃ (২)

"মানুষের একলা হবার প্রবৃত্তিই হচ্চে তার রিপু, সত্যভাবে মিলিত হবার সাধনাই কল্যাণ।

---

(২) অধুনালুপ্ত—"সংহতি" কাগজে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কমিউনিজম্ সম্বন্ধে প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

এই দুই-এর বিরোধ নিয়ে কুরুক্ষেত্র-লড়াই মানুষের ইতিহাসে চলে আস্‌চে। এখনো মানুষ শান্তি পর্ব্বে এসে পৌঁছয় নি।

"সংহতির মূল প্রবর্ত্তনার ভিন্নতা অনুসারে তার প্রকাশের ভিন্নতা ঘটে, এই মূল প্রবর্ত্তনা যদি রাষ্ট্রিকতা (politics) হয়,পররাষ্ট্রের প্রতিযোগিতায় স্বরাষ্ট্রকে শক্তিমান ও সম্পৎশালী করে' তোলবার চেষ্টা হয়, তবে তার দ্বারা যে-সংহতি ঘটে সে হয় অহমিকার সংহতি, তার বাহ্যরূপে একটা মিলনের চেহারা দেখা যায় কিন্তু তার মূল তত্ত্ব মিলন-তত্ত্ব নয়, প্রধানত সে হচ্চে দ্বন্দ্ব। সেই বিরাট অহমিকার মেদস্ফীত আত্মম্ভরিতাকে অস্ত্রে শস্ত্রে রত্নালঙ্কারে ভূষিত দেখে লুব্ধ মানুষ তার পূজায় প্রবৃত্ত হয়। এই পূজার প্রধান আয়োজন নরবলি।

"সেই বলির মানুষ যে কেবলমাত্র পররাষ্ট্রের মানুষ তা' নয়। আপন দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে যন্ত্রের মধ্যে ফেলে খর্ব্ব না কল্লে এই রাষ্ট্রিকতার পুষ্টি হয় না। তার শক্তি-মূর্ত্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে কেটে ছেঁটে জুড়ে তেড়ে সৈনিকরূপে নিজের জয়রথ তৈরি করে, যে পর্য্যন্ত না এই রথে করেই তার শ্মশান যাত্রা ঘটে। তার

ধনমূর্ত্তি লক্ষ লক্ষ মানুষকে পঙ্গু করে' তাদের পিণ্ড পাকিয়ে নিজের জয়স্তম্ভকে অভ্রভেদী করে' তুলতে থাকে, যে পর্য্যন্ত না এই স্তম্ভ বিদীর্ণ করে' নৃসিংহ বেরিয়ে আসে।

"মানুষের ইতিহাসে এর আগে অনেক দুঃখ দুর্ঘটনা ঘটেচে। শক্তির লোভ ধনের লোভ চিরদিনই নররক্ত-পিপাসার পরিচয় দেয়। তার স্বর্ণলঙ্কায় চিরদিনই দেবতাদের হাতে হাতকড়ি পড়েচে। তার দশমুণ্ড বিশ হাত দশ দিকে ধর্ম্মকে উপেক্ষা করবার জন্য উদ্যত। তাই চিরদিনই তার স্বর্ণলঙ্কায় কোনো না কোনো সময়ে আগুনও লেগেচে।

"কিন্তু বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের সহায়তায় এই রিপু যে রকম কঠিন উপকরণে বিরাট আকারে আপনার গড় বেঁধেচে এমন কোনোদিন করেনি। এর তাড়কারাক্ষসীর দল জগৎসুদ্ধ লোককে তাড়না করে' অতিষ্ঠ করে' তুলেচে। অবশেষে আজ এই সংহতির চেলাদের মধ্যে কেউ কেউ কেঁদে বলচে "শান্তি চাই, শান্তি চাই।" কেন না এবারকার লঙ্কাকাণ্ড ত্রেতাযুগকে হারিয়ে দিয়েচে।

"কিন্তু রিপুও পুষব শান্তিও পাব বিধাতার

সঙ্গে এমনতরো চাতুরী ত চলে না। চোরাই মালে ঘর বোঝাই করে' বিচারকের কাছে মাপ চাইব এমন দরবার ত মঞ্জুর হবে না। আগুনের পর আগুন লাগবে, যুদ্ধের পর যুদ্ধ বাধবে।

"ইতিমধ্যে মানুষের ইতিহাসে অন্ধকার গুহার মধ্যে একটি উপেক্ষিত শক্তি গোপনে আপনার বেগ সঞ্চয় করছিল। পরোপজীবি হ'য়ে যে ব্যবস্থা আপনাকে পোষণ করে একদিন তার উপজীবিকাই তার পরম শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার মত এমন দাসতন্ত্র সভ্যতা আর নেই। এই সভ্যতা উপকরণ-বায়ুগ্রস্ত। এই উপকরণের অধিকাংশই তার পক্ষে বাহুল্য। অথচ একে তৈরি করতে, এর ভার বহন করতে, একে রক্ষা করতে বহু দাসের দরকার। তাদের না হ'লে এ সভ্যতার একদিনও চলে না। তার মানে হচ্চে এইখানেই এর সকলের চেয়ে দুর্ব্বলতা। তার বিপুল ঐশ্বর্য্যের দ্বারাতেই এতদিন তার এই দুর্ব্বলতা ঢাকা পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে এইটে প্রকাশ হ'য়ে পড়চে।

"যারা অত্যাবশ্যক তাদের আবশ্যকতাই তাদের ঐশ্বর্য্য। যতদিন এ কথা তারা না জানে

ততদিন নিজের মূল্য বোঝে না বলেই তারা এত সস্তায় বিকিয়ে যায়। বর্ব্বরের দেশে, শোনা যায়, গজদন্ত পুঁতির মালার দরে বিকিয়ে গেছে। যখন তারা বাজার-দরের খবর পেয়েচে তখনই দামও চড়ে গেছে, তেমনি একদিন ইউরোপের রাষ্ট্রিক প্রতাপ দাসের কাঁধে চড়ে' জগৎ জয় করে' বেড়িয়েচে। দাসের দল ভেবেছিল যারা তাদের চালাচ্ছিল তারাই চালাক। অতএব কাঁধ পেতে দিতেই হবে। ইদানীং তারা এই সহজ কথাটা আবিষ্কার করেচে যে তারা না চালালে উপর-ওয়ালারা অচল। তারা অত্যাবশ্যক, অতএব বর্ত্তমানের ঐশ্বর্য্য তাদেরই হাতে। এই আবিষ্কারের জোরে বর্ত্তমান সভ্যতার বাহনের দল মাঝে মাঝে কাঁধ-ঝাড়া দিতে আরম্ভ করেচে—আর উপরে যারা বসে' আছে তারা অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে উঠেচে। শক্তির যে উপলব্ধি উপরে চড়ে বসেছিল সেই উপলব্ধিটা নীচে বাহনের মধ্যে প্রবেশ করেচে।

"এই বাহনদের সংহতিই যে মানুষের সকল সংহতির চেয়ে বড় তা আমি মনে করিনে। কেননা এখানেও দ্বন্দ্বের প্রভাব। শক্তি উপরে

বসেও নখদন্ত চালনা করে, নীচে নেমেও সে বৈষ্ণব হ'য়ে ওঠে না। আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় এসিয়াবাসীদের সঙ্গে পাশ্চাত্যদের যে অন্যায় বিরোধ দেখা যায়, তার মধ্যে কেবল যে ধনীদের হাত আছে তা নয়, ধনের বাহনদের হাতও আছে।

"কিন্তু ইউরোপে কর্ম্মজীবিদের যে দল বেঁধে উঠচে তার মধ্যে একটি বড় কথা আছে। সে হচ্চে এই যে, এই দল নেশনের বেড়াকে একদিন সম্পূর্ণ অতিক্রম করবে এমন আশা দেখা যাচ্চে। কারণ ধনের রথযাত্রায় যে দড়িটা ধরে টান দিতে হচ্চে সে দড়িটা সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে চলে গেছে, যারা টানচে তারা সকল দেশেরই মানুষ। এই দড়িটার ঐক্যেই তারা এক। তাই এই ঐক্যটাকে অবলম্বন করেই তারা সম্পূর্ণ আঁট বাঁধতে পারবে।

"যদি এই আঁট বাঁধা সম্পূর্ণ হয় তাহলে পৃথিবীতে একদিন একটা অতি প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হবে। এই দুঃসহ শক্তির প্রলোভনই সোভিয়েট সম্প্রদায়কে বিচলিত করেছিল। তারা তাড়াতাড়িতে এইটেকে জাগ্রত করতে লোলুপ

হ'য়ে উঠেছিল। এবং সকল লোলুপতারই যে লক্ষণ, নিষ্ঠুরতা ও জবরদস্তি—তা সেখানেও দেখা দিয়েছিল।

"যাই হোক, শক্তির লীলা সমাজের উপরের স্তরে আপনার ভাঙাগড়ার কাজ অনেকদিন ধরে করে' এসেচে। এই শক্তি এবার নীচের স্তরে আপনার কাজ করবে বলে উদ্যোগ করচে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। এই স্তরে যখন তার আধিপত্য দেখা দেবে তখনই যে মানুষের সকল পাপ মোচন হবে আর শক্তি তার শৃঙ্খল রচনার চিরকেলে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে রাতারাতি মানুষের মুক্তি-সাধনায় প্রবৃত্ত হবে এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে। তবে এই কথা সত্য যে, সুখ দুঃখ ভালো মন্দের প্রবল সংঘাতের দ্বারাতেই শক্তি সৃষ্টি-কার্য্যের প্রয়োজন সাধনা করে—ভূমিকম্প-দৈত্যদের হাতুড়ি-পিটুনির চোটেই আজকের দিনের এই পৃথিবী তৈরী হ'য়ে উঠেচে। সমাজের নীচের তলায় যে উপকরণ ভাণ্ডারে এতদিন শক্তির কারখানাঘর বসেনি আজ সেখানে যদি বসে তাহলে মানুষ তাতে করে' নিছক সুখ পাবে না, তাকে অনেক নতুন নতুন ব্যথা সইতে হবে।

সৃষ্টি-কার্য্যে এই ব্যথার দরকার আছে। অতএব তার জন্য প্রস্তুত থাকাই ভালো।

"পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষের ইতিহাসের যে চেষ্টা আজ দেখতে পাচ্চি, ভারত তার থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে থাকলে বঞ্চিত হবে। নতুন শক্তির যে বিশ্বব্যাপী মন্দির তৈরি হচ্চে তার একটা সিংহদ্বার রচনার ভার ভারতকেও নিতে হবে।"

মহেন্দ্র বাবু কেবল যে ব্যক্তিতন্ত্র চান তাই নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও তিনি চান—এইজন্যই তিনি সাম্যবাদের বিরোধী। আসলে কিন্তু স্বাতন্ত্র্যই সব চেয়ে বড়ো জিনিষ নয়। একা থাকার মধ্যে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, কিন্তু সার্থকতা তাতে নেই; সার্থকতা আছে সকলের সঙ্গে সমান হ'য়ে মিলতে পারাতে, বহুর সঙ্গে হুবহু এক হ'য়ে যাওয়াতে। যে মিলনের রস পেয়েচে সে-ই এ তত্ত্ব জানে। চরিতার্থতা লাভ করতে হ'লে অপরের সঙ্গে মিলে তা লাভ করতে হবে, একার বাহাদুরিতে তা মেলে না; সকলে সম্পূর্ণ হ'লে তবেই আমি সম্পূর্ণ হ'তে পারি। কেউ যদি ধনের মানের আভিজাত্যের তুঙ্গ শৃঙ্গে একক

থাকতে চায়, তার শিং ভেঙে তাকে জোর করে' মিলনের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনাটা তার প্রতি মোটেই জবরদস্তি নয়, বরং সেইটেই জবর দোস্তির পরিচয়।

মহেন্দ্রবাবুর মতে, 'ব্যক্তিত্বকে একাকারতার' মধ্যে বিনিঃশেষ করাই হচ্চে, সাম্যবাদের মূল প্রেরণা। তিনি বলচেন—'বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে আপনাকে বিকশিত করবার এই যে চেষ্টা এ হচ্চে বিশ্বশক্তির অন্তরতম কামনা। এই ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করবার চেষ্টা, ব্যক্তিধর্ম্মকে অখণ্ড একাকারতার মধ্যে বিলীন করবার চেষ্টা হচ্চে বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধ চেষ্টা।'

প্রকাণ্ডতম আস্তিক হ'য়েও, মহেন্দ্র বাবুর বিশ্বাস হোলো যে বিশ্বে বাস করেও, সাম্যবাদীরা, বিশ্বশক্তির অন্তরতম কামনাকে কেবল যে অগ্রাহ্য করচে তাই নয়, তার বিরুদ্ধ চেষ্টা করে' তাকে বিধ্বস্ত, করেও তাদের বাড় বাড়চে। কিন্তু প্রচণ্ডতম নাস্তিকেরও এ কথা বিশ্বাস করতে ঈষৎ সঙ্কোচ হবে। আমি তো মনে করি, মহেন্দ্রবাবুর তথাকথিত বিশ্বশক্তির অন্তরতম কামনাকে পূর্ণ করার প্রেরণাই হচ্চে সাম্যবাদের। বহু প্রচ্ছন্ন

ও আচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বকে বিচিত্র প্রকাশে সার্থক করে' তোলার জন্যই এর অভ্যুদয়। বিশ্বশক্তির মনোবৃত্তির সঙ্গে যাঁদের এক আধটু পরিচয় আছে, যেমন শ্রীঅরবিন্দের ও রবীন্দ্রনাথের, তাঁরা কি সেইটাই বেশি সম্ভব বলে' মনে করেন না ?

মহেন্দ্রবাবু যান্ত্রিকতার নিন্দা করেচেন, বলেচেন—বিজ্ঞানের কৃপায় যান্ত্রিকতার আবির্ভাব হয়েচে, আর এই যান্ত্রিকতাই ব্যক্তির মর্য্যাদাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করচে। তাঁর এ কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু এটা হয়েচে তাঁর ব্যক্তিতন্ত্র আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে, যার পক্ষে তাঁর এতটা ওকালতি! সাম্যবাদের যুগে, এই যান্ত্রিকতাই মানুষকে ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা দেবে, তার পূর্ণতা-সাধনার প্রধান সহায় হবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও যান্ত্রিকতার সাহায্যে এ যুগের মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিন চার ঘণ্টার বেশি খাটার প্রয়োজন হবে না, বাকি বিশ ঘণ্টা সে আপনার পূর্ণতার কথা ভাববে, ব্যক্তিত্বের সাধনা করবে। যন্ত্রের ভেতরে কিছু শয়তান নেই, তা আছে যন্ত্রীর মনে। মারতে হ'লে হাতই চালাই, কিন্তু আলিঙ্গনে বাঁধতে হ'লে সেই হাতই চালাতে হয়।

মহেন্দ্রবাবুর ধারণা, পৃথিবীতে যারা ব্যক্তি কেবল তারাই ব্যক্তি, আর যারা নয় তারা ব্যক্তি নয়, তারা Mass—গণমানব। অতএব গণমানবের কর্ত্তব্য নয় এই মুষ্টিমেয় দুর্ল্লভ ব্যক্তির মূল্যবান ব্যক্তিত্ব ফলানোতে বাধা দেওয়া। কিন্তু এই যে অসংখ্য মানবসমষ্টি—তাদেরো আত্ম-বিকাশের প্রয়োজন আছে বা তারাও প্রত্যেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি হ'তে পারে, এটা মহেন্দ্র বাবু কখনও মনে করেন না। মহেন্দ্রবাবুর মতে তথাকথিত ক্ষণ-জন্মা ব্যক্তিরা চিরজন্ম এদের, এই মুখাপেক্ষী গণমানবের, 'ভাগ্য নির্ণয়' করে' দেবেন; ব্যক্তি হিসেবে নিজের 'পথ-নির্ব্বাচন' করবার শক্তি হতভাগ্য-এদের কোনো দিন হবে না, কেননা তা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু মহেন্দ্রবাবু ভুলে যাচ্চেন, কয়েকজন মানুষ আর-সবাইকে চালাবে এটাই অস্বাভাবিক, এ হচ্চে সভ্যতার অপরিণত অবস্থার লক্ষণ; সমাজের পারফেক্ট অবস্থায় এ ব্যাপার কিছুতেই সম্ভব নয়। চিরদিন যা চলে এসেচে তাই যে চিরদিনই চলবে এমন কিছু লেখা নেই।

তার পরের কথা, ব্যক্তিত্ব বস্তুটা আসলে কী?

অনন্তের সঙ্গে রহস্যময় সংযোগ ঘটলে মানুষ আপনার অন্তর্লোক থেকে নিজেকে উন্মোচিত করতে থাকে, তাই হচ্ছে তার ব্যক্তিত্ব। অনন্তের পরিচয়ে মানুষ আপনার পরিচয় পায়, আপনাকে জানে ; নিজেকে প্রকাশ করবার আশ্চর্য্য কৌশলও সেখান থেকেই সে আয়ত্ত করে। মানুষকে যদি তার দারিদ্র্য থেকে, তার অজ্ঞানতা থেকে, তার তুচ্ছতা ও তার প্রত্যহের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিতে পারি তাহলে তাদের প্রত্যেকে অতি সহজেই আপনাকে প্রকাশ করবার স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রেরণা পাবে। অনন্তের সঙ্গে সংযোগ সব চেয়ে সহজ হ'য়ে ওঠে যদি সেই মিলনের বাধা-গুলো সব আগে দূর হয়, তখন অনন্তের সহিত সাম্যযোগে প্রত্যেক মানুষই বিরাট বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ এবং প্রত্যেকের সমান। অনন্ত কতিপয় ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নয়, তার অফুরন্ত ভাণ্ডারে প্রত্যেক মানুষেরই সমান অধিকার ; সাম্যবাদ মানুষকে আত্মার সেই ঐশ্বর্য্যলোকে নিয়ে যেতে চায়। এখন রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ প্রভৃতি কয়েকজন মানুষের মধ্যে সৃজনী-শক্তির যে অপূর্ব্ব লীলা দেখে আমরা মুহ্যমান হ'য়ে পড়েচি সেই সৃজনী-শক্তি (creative force) তখন সমস্ত মানুষের

মধ্যে মুক্ত হবে। তার ফলে মানুষের সভ্যতা সে-দিন যে কী রূপ, কী গতি ও কী বিপুল সার্থকতা লাভ করবে তা আজ কল্পনা করবারও কারও শক্তি নেই। অতঃপর এই কথা মহেন্দ্রবাবু দয়া করে' মনে রাখবেন যে প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তি হ'তে পারে, যদি তারা ব্যক্ত হ'তে পারে। এবং এই ব্যক্ত হওয়ায় পথেই সাম্যবাদ মানুষকে নিয়ে চলেচে।

শূদ্র না ব্রাহ্মণ?

সমস্ত শূদ্রকে ব্রাহ্মণ বলে' ঘোষণা করা হোক, এই রকম একটা প্রস্তাব সম্প্রতি হয়েচে।

এই প্রস্তাবে আমার আপত্তি। পৃথিবীর কোথাও একদল মানুষ আছে যারা নরখাদক, সেই কারণে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে নরখাদক বলে' ঘোষণা করা হোক—এই মতে আমি কিছুতেই সায় দিতে পারিনে। বরং আমার মতে, সম্ভব হ'লে, নরখাদকদেরই মানুষ করার পক্ষে চেষ্টা হওয়া উচিত।

'ইয়াঙ্কি' এই শব্দটি উচ্চারণ করলে পৃথিবীর আজ যে-কোনো প্রান্তে যে-কেহ সমঝ্দার লোক বুঝতে পারে যে এই নামধেয় যে জাতি, তারা বর্ব্বরতার একটা সভ্যরকম রূপ দিতে পেরেচে, অত্যাচারকে শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে চালাতে পেরেচে এবং শোষণের ফলে শোষিতের মধ্যে আনন্দ-সঞ্চার করতে পেরেচে—এইরূপ

অসাধারণ প্রয়োগ-নৈপুণ্য আছে বলে'ই তারা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য। বর্ত্তমান যুগে 'ইয়াঙ্কি' যা সম্ভব করেচে সেই বস্তু অতি প্রাচীন যুগেই আমাদের ব্রাহ্মণেরা সমাধা করেছিলেন। এজন্য তাঁরাও কম নন—পৃথিবীর আদিম আশ্চর্য্য তাঁরা।

শোষণের জন্যই শাসন—এই সনাতন মূলনীতির মূলাধার ব্রাহ্মণ। শোষণকে প্রচ্ছন্ন করতে হ'লে শাসনকে একটা আদর্শের নামে খাড়া করতে হয়, অতীত কালের ব্রাহ্মণ ডিপ্লোমাসির এই নিগূঢ় তত্ত্বেও বিচক্ষণ ছিলেন। ভারত যে এককালে সভ্য ছিল অর্থাৎ বর্ব্বরতাকেও লজ্জা দিতে পেরেছিল—সেকালের বামুনেরাই তার প্রমাণ।

'ঙ'—এই একাধিক দশম বর্ণকে অনুনাসিক সুরে উচ্চারণ করলে যে-প্লুত স্বরের সৃষ্টি হয় তার সহিত সম্পর্শ ঘটলে শূদ্রের বিষম দশা। তা যদি শূদ্রের কণ্ঠ থেকে বেরয় তাহলে তার জিভ কেটে ফেলতে হবে, এবং যদি কাণের ভেতর ঢোকে তাহলে তার কর্ণকুহরে শিসে গলিয়ে ঢালার ব্যবস্থা। বামুনদের সভ্যজনোচিত শাসন-নীতির এমন বহুতর দৃষ্টান্ত মনুসংহিতার

পাতায় পাতায়। জলদস্যুদের যে-সব বংশধর আধুনিক কালে সভ্য হ'য়ে উঠেচে, শাসননীতির দিক দিয়ে, 'দেববংশসম্ভূত' পৌরাণিক ব্রাহ্মণ-দের এখনো তারা লজ্জা দিতে পারেনি।

শোষণ-নীতির দিক দিয়েই পেরেচে কি ?

আমি বলি, উঁহু।

ইংরেজরা রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতিকে জড়ীভূত করবার চেষ্টা করেচে বটে, কিন্তু প্রায়ই তার জোড় ভাঙে—তখন দ্বিধাগ্রস্ত দুই নীতির আপনা-আপনির মধ্যে ঠোকাঠুকি লেগে যায়। কিন্তু সেকালের ব্রাহ্মণ ধর্ম্মনীতির সঙ্গে অর্থ-নীতির যে-সমন্বয় সাধন করেছিলেন তা আজো অক্ষুণ্ণ রয়েচে,—তাঁরা সেই প্রাচীন যুগে যে শোষণ-যন্ত্রের স্থাপনা করেছিলেন তার যন্ত্রণাহীন চক্রতলে নিষ্পিষ্ট হ'তে আজো আপনা থেকেই লোক এগিয়ে আসে। তাঁদের দূরদৃষ্টি ছিল ; কেননা এই মানুষ-পেষা কল চালিয়ে তাঁদের বংশধরেরা সেদিন পর্য্যন্ত নিজেদের দুরদৃষ্টকে ঠেকিয়ে এসেচে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাকসো-আদায়ের যে 'শিডিউল' তাঁরা সেকালে বেঁধে দিয়ে গেছেন,

একালে এমন কোনো অর্থনীতিক মাথাই নেই যে তার সমকক্ষ একটা কিছু সৃষ্টি করতে পারে। বারো মাসে তের পার্ব্বণ, নিত্য-নৈমিত্তিক দেবার্চ্চনা, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ এসব তো বরাবর লেগেই আছে—এসব উপলক্ষে পৌরহিত্য করবে কে? বামুন। দান করব কাকে? বামুনকে। দানেরই বৈচিত্র্য কত রকম! সোণারূপো হাতী ঘোড়া গরু ভেড়া কাপড়-চোপড় বাসন-কোশন থেকে আরম্ভ করে' কাহন কাহন কড়ি পর্য্যন্ত—যার যেমন সাধ ও সাধ্য!

শুধুই কি দান? তার সঙ্গে গণ্ডে পিণ্ডে ভোজন! নিতান্ত কম পক্ষে অন্তত 'দোয়াদশ-টিকেও' খাওয়াতে হবে। এবং ভোজনের সঙ্গে দক্ষিণাটাও নগদ! অথচ দাতার আনন্দ ধরে না! এই যুক্তিহীন নির্ব্বিচার দানের ফলে তাঁর অক্ষয় স্বর্গবাস কায়েম হচ্চে! শোষণের ফলে তোষণের সৃষ্টি করার এই যে প্রতিভা, আমি শুধু ভাবি, এ সে-যুগে সম্ভব হোলো কি করে'? ইতিহাসের মতো, সভ্যতাও কি খোল নলচে বদলে আসে?

আরো বিস্ময় এই যে, আওরঙ্গজেবের বহু-পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করে'ও মানুষের ওপর ট্যাক্‌সো আদায়ের যে কায়দা-কানুন তাঁরা বের করেছিলেন তা যেমন বিচিত্র, তেমনি অপূর্ব্ব ; এমন কি এ বিষয়ে তাঁরা পরবর্ত্তী আওরঙ্গজেবকেও টেক্কা দিয়ে গেছেন। মনে করুন, কোনো ভাগ্যবান ভারতভূমিতে জন্মালেন। ছ'দিনের দিন তাঁর ষেটেরা পূজা, ছ'মাসে অন্নপ্রাশন, ছ'বছরে উপনয়ন (১), তারপর বিয়ে, তারপরে তাঁর বংশবৃদ্ধি এবং সবশেষে তাঁর শ্রাদ্ধ!—এর সব উপ-'লক্ষ্যেই বামুনদের ট্যাক্‌সো দিতে হবে। এমন কি মরে'ও খাজনা এড়াবার, ফাঁকি দেবার যো নেই। অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ একদা যে জন্মেছিলেন, তার জন্য অতি আধুনিক প্রপৌত্রকে প্রতি বছরে ট্যাক্‌সো দিতে হয়। শ্রাদ্ধ গড়ায় অনেক দূর।

(১) শূদ্রের না হ'লেও ক্ষত্রিয় বৈশ্য এদের উপনয়ন হোতো—ব্রাহ্মণেতর সবাইকে আমি শূদ্রের মধ্যে ধরেচি, যেহেতু তাঁদের বংশধররা আজ সবাই শূদ্র। অবশ্য বামুনের ছেলেরও উপনয়ন হোতো,—নিজেদের নিয়ম নিজেরাই তো নাকচ করতে পারেন না ; এইজন্য বামুনেরা নিজেদের বেলা 'মাকড় মারলে ধোকড় হয়'—এই ভাবে নিয়ম রক্ষা করতেন।

বণিকবৃত্তি বা ব্যবসা-বুদ্ধিতেই কি তাঁরা কম ছিলেন ? এমন অপবাদ কোনো শত্রু, এমন কি আমিও দিতে পারব না। বিনা পুঁজিতে লিমিটেড্ বা আন্‌লিমিটেড্ কোম্পানি গঠন করে' যে-সব কারবার অতি পুরাকালে তাঁরা ফেঁদে গেছেন আজ পর্য্যন্ত তার একটাও দেউলে হয় নি, বরং লভ্যাংশ দিন দিন বেড়েই চলেচে। গুরুগিরির ব্যবসাটাই কি কম ফলাও ? কিঞ্চিৎ শব্দব্রহ্মের বিনিময়ে বংশানুক্রম কাণ মলে' কাঞ্চনমূল্য আদায়! বিনা ট্রেড্ মার্কে এই ব্রহ্মের-ব্যবসা চলে! তীর্থ, মঠ, গুরু, মোহন্ত—এদের আয়ের কাছে ফোর্ড্ সাহেবের আয়ও কিছু না। ফোর্ড্ সাহেব টাকা নেন্ তার বদলে দেন্ হাওয়া-গাড়ি, আর এরা টাকা নেয় তার বদলে দেয় ফাঁকা হাওয়া।

সভ্যতার দুটো দিক, একদিকে তার হীনবৃত্তি আর একদিকে তার উদ্বৃত্তি। একদিকে সে বর্ব্বর—নিজে বাঁচবার জন্য অপরকে মারতে সে প্রস্তুত; বিধাতার দেওয়া দুটো হাত আলিঙ্গন করার পক্ষেই যথেষ্ট, অপরকে শাসন ও শোষণ করার জন্য তাই সে এখানে আরো ছটা হাত সৃষ্টি করে' সেজেচে অক্টোপাশ;

এখানে তার কূট চাল ও নখদন্ত কখনো প্রকাশ্য কখনো প্রচ্ছন্ন। ইউরোপীয় সভ্যতার এই দিকে আছে বার্কেন্‌হেড্‌, ডায়ার্‌—এদের মত লোকেরা।

কিন্তু সভ্যতার আরেকটা দিক আছে যেখানে তার উদ্বৃত্তি, যেখানে তার ঐশ্বর্য্য, যেখানে সে অপরকে দিতে উন্মুখ, যেখানে সে অপরকে বাঁচালে ভাবে আমি বাঁচলুম; যেখানে অপরে অসম্পূর্ণ থাকলে তার পূর্ণতা নিরর্থক মনে হয়; যেখানে সে বলে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌। ইউরোপীয় সভ্যতার এদিকে আছে ইউরোপের দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক, শিল্পী-কবি-মনীষিরা। সভ্যতার এই অংশটাই অপরাংশকে অসম্পূর্ণতার লজ্জা ও অগৌরব থেকে মোচন করে, তার ভারকেন্দ্র স্থির রাখে, সভ্যতাকে যাতে সভ্যতা বলে'ই সন্দেহ হয়—এমন বিভ্রম রচনার চেষ্টা করে।

কিন্তু ব্রাহ্মণদের প্রাচীন সভ্যতায় আমরা কেবল প্রথমাংশেরই পরিচয় পাই যেখানে সে আত্মপ্রসারের জন্য দু'হাতে কেবলি নিয়েচে; কিন্তু আত্মপ্রসারের জন্য যেখানে দু'হাতে দিতে হয় সভ্যতার সেই ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের দেখি অতি

কদাচ। একেবারেই যে দেখিনে তা নয়, কেন না বামুনদের মধ্যেও কখনো কখনো মানুষ জন্মানো সম্ভব।

এইজন্য ব্রাহ্মণ-সভ্যতার একদিকে যেমন মনু, পরাশর, পরশুরাম, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতিকে দেখতে পাই যারা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দোহন করেচে, শাসন করেচে, নির্ব্বিচারে হত্যা করেচে ও চক্রান্ত করেচে; তেমনি অপরদিকে বাল্মিকী ও বেদব্যাসের মতো অপরাজেয় স্রষ্টার সন্ধান পাইনে। এইজন্য সভ্যতার যে-একাংশে বামুনের একছত্র, সেখানে তারা যা রেকর্ড্ রেখে গেছে এ অবধি বহু বহু সভ্যজাতি প্রাণপণ চেষ্টা করে'ও সেই রেকর্ডের কাছাকাছিও এগুতে পারে নি। ব্রাহ্মণ পরশু-রামের সঙ্গে ম্লেচ্ছ ডায়ারের তো তুলনাই চলে না, হত্যা-নৈপুণ্যে পরশুরামের কড়ে আঙ্গুলের যোগ্যতাও ডায়ারের নেই।

ব্রাহ্মণ-সভ্যতাই যদি ভারতীয় সভ্যতার শেষ কথা হোতো তাহলে তেমন দুর্দ্দিন পৃথিবীর আর কিছু ছিল না। ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য এড়িয়ে উঠতে না পারলেও তার সভ্যতাকে পেরিয়ে যা উঠেছিল তাই হচ্ছে হিন্দু সভ্যতা—এই সভ্যতারই

দিগ্ব্যাপ্ত কিরণের মধ্যে ব্রাহ্মণের কলঙ্কও অনেকটা শোভার মতই দেখাচ্চে। এই সভ্যতা হচ্চে ব্রাহ্মণেতর জাতির সৃষ্টি।

ব্রাহ্মণ-সভ্যতার দুটি মাত্র পুঁজি, মনুসংহিতা ও পরশুরামের পরশু; পেনাল কোড আর আর রেগুলেশন লাঠি। কিন্তু হিন্দু সভ্যতার মধ্যেই আমরা পাই ভারতের দর্শন, কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য—তার ঐশ্বর্য্যের সহস্রমুখী পরিচয়। তার মধ্যেই আমরা পাই, দস্যু বাল্মিকীর রামায়ণ, জেলেনীর ছেলে বেদব্যাসের মহাভারত। যে উপনিষদের গর্ব্বে আমরা মশ্‌গুল, তারও বেশির ভাগ ক্ষত্রিয়ের রচনা। আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন, ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগেও অব্রাহ্মণেরই প্রতিভা।

এই হিন্দুসভ্যতায় ব্রাহ্মণের দান অতি সামান্যই, বলতে গেলে ব্রাহ্মণের থেকে যেটুকু নিয়েচে—বর্ণ-বিচার, স্পর্শদোষ আর 'ন-স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—সেটুকুই এর কলঙ্ক। ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রভাবিত না হ'লে এ সভ্যতা আরো প্রাণ-বাণ, আরো শক্তিশালী হ'তে পারত—এ সভ্যতা বিশ্ববিজয় করত। এই সভ্যতায় অনার্য্যের দান

আছে, বৌদ্ধের দান আছে, মুসলমানের দান আছে। এর স্রষ্টাদের মধ্যে এককালে ক্ষত্রিয় বৈশ্য হয়ত ছিলেন, কিন্তু আজ তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব নেই, বিপুল শূদ্র-শক্তি তাঁদের আত্মসাৎ করেচে। শূদ্রের দ্বারাই এই সভ্যতার সৃষ্টি ও পুষ্টি, এ জন্য আমি একে বলব শূদ্র-সভ্যতা। এবং এই জন্যই এ বিরাট, এই এর মাহাত্ম্য—ব্রাহ্মণ-সভ্যতার চেয়ে ঢের বড়ো এই হিন্দুসভ্যতা। ব্রাহ্মণ না জন্মালেও এ হোতো এবং ব্রাহ্মণ লোপ পেলেও এ থাকবে। বরং বামুনের প্রাধান্য লোপ পেলে এই সভ্যতার প্রাণশক্তি পূর্ণ-মুক্তি পাবে এবং বৌদ্ধযুগে যেমন হয়েছিল, তেমনি ভারতের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য্য আবার সহস্রদলে আত্মপ্রকাশ করবে। এই কথাটাই আজ স্পষ্ট হওয়া চাই।

হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের প্রভাব কি উপায়ে ঘোচানো যায় তাই আজকের সমস্যা। আজকের সমাজের ওপর আজকের বামুনদের, বামুন বলে' কোনো প্রভাব আছে, এ আমি মনে করিনে। যে ব্রাহ্মণ এখনো এর কাঁধে কণ্ঠরোধ করে' চেপে রয়েচে তা অতীতের কঙ্কাল-মূর্ত্তি—তার কবল

থেকে মুক্ত করা মানে একে অতীতের কবল থেকে মুক্ত করা। এবং এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আর যে-উপায়ই থাক, সমস্ত হিন্দুকে বামুন বলে' ঘোষণা করা সে উপায় নয়।

কেননা, প্রথমত এর দ্বারা হয় সমস্ত হিন্দুর অপমান ; দ্বিতীয়ত—যে-বস্তুর বিলোপ বাঞ্ছনীয় এবং বস্তুত যা লোপ পেতে বসেচে তাকেই ব্যাপক ভাবে কেবল মর্য্যাদা দেওয়া নয়, তাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়।

তাই ঘোষণা যদি করতেই হয়, আব্রাহ্মণ-নির্ব্বিশেষে সবাইকে শূদ্র বলে' ঘোষণা করাই ভাল, কেন না শূদ্র বামুনের চেয়ে মহত্তর জাতি। 'মহত্তর' বল্লাম বলে' কেউ যেন না মনে করেন যে বামুনদের, জাতিহিসেবে, আমি আদৌ মহৎ বলে' মনে করি। কিন্তু মহৎ বলে' মানি আর নাই মানি, নিপুণ বলে' তাঁদের স্বীকার করব। যে অশ্বমেধের ঘোড়া দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিল তার মুখে লাগাম লাগিয়ে তাকে ময়লা-টানা গাড়ির সঙ্গে বেঁধে দেওয়ার মধ্যে মহত্ত্ব না থাক, নৈপুণ্য আছে যথেষ্ট। যে শূদ্র-ভারত, একদা বৌদ্ধ যুগে আপন আত্মার পূর্ণ প্রকাশকে ধরে' রাখতে

না পেরে, নিজের দেশ ছাপিয়ে, অর্দ্ধেক পৃথিবী জুড়ে তার আদর্শের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চেয়েছিল, তাকেই আবার গৃহপথের ভেতরে ফিরিয়ে কোণঠাসা করে' আনা এবং কেবল ইচ্ছামাত্র তার গতিরোধ নয়, ইচ্ছামত তাকে দিয়ে ব্রাহ্মণ্যের সমস্ত ময়লা টানানো সামান্য বাহাদুরি নয়। মুষ্টিমেয় ইংরেজ যে-নৈপুণ্যে ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে শাসন করে, মুষ্টিমেয় বামুণের নৈপুণ্য তার চেয়ে কিছুমাত্র খাটো নয়। ইংরেজের সম্মুখে আছে সঙ্গীন্ বন্দুক, কিন্তু বামুনের মুখে কেবল সংস্কৃত শ্লোক,—বিসর্গের বুলেট দিয়ে যে-সাম্রাজ্য আদি যুগ থেকে এ পর্য্যন্ত সে রক্ষা করেচে, ভূগোলের মধ্যে তার বিস্তার না থাকুক, ভূলোকের দীর্ঘতম কালের ইতিহাসকে তা আচ্ছন্ন করে' রইলো।

এই জন্যই মনে হয় যে ভারতের ইতিহাসের গতি বদলাতে হ'লে আগে বামুনের একটা গতি করা দরকার। অমৃতসরে ডায়ার ভারতের লোককে কি করে' বুকে হাঁটাতে পেরেছিল, এই ভেবে আমরা চমৎকৃত হই। সরীসৃপকেই বুকে হাঁটানো যায়, মানুষকে নয়। যুগ-যুগান্তর ধরে'

যে-জাতি সূত্রগুচ্ছ দেখলেই বুক দিয়ে মাটি আশ্রয় করেচে সঙ্গীন্ দেখলে সে যে আরো অনায়াসে তাই করবে এ তো আশ্চর্য্য কিছু নয়। কেন না সঙ্গীন্ ব্রহ্মশাপের চেয়েও সঙীন এবং তার গুঁতো সূতোর চেয়ে ঈষৎ কঠোর! বামুনকে কাঁধ থেকে নামাতে না পারলে এ জাত কোনোদিনই সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারবে না। মনুর সত্ত্ব লোপ না পেলে পূর্ণতর মনুষ্যত্বের বিকাশ এ দেশে আকাশ-কুসুম।

এ জাতির প্রাণশক্তি যে সহস্র ধারায় উচ্ছলিত হ'য়ে ওঠে না তার কারণ সামান্য সঙ্কীর্ণ পথেও আপনাকে প্রকাশ করবার সুযোগ তার নেই—এই জন্য কোনদিনই তার নিজেকে জানা ও নিজেকে পাওয়া ঘটলো না ; পৃথিবীর কাছেও সে অপরিচিত থেকে গেল। মনের সহিত মনের সম্পর্শ ও সংঘর্ষের ফলেই চেতনার ভাণ্ডারে শক্তির সঞ্চয় সম্পূর্ণ হ'তে থাকে—সেই শক্তির সাহায্যেই মানুষ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বা সমাজের ক্ষেত্রে জাতি হিসেবে বা ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে। আমাদের সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার সব কটা পথই রুদ্ধ।

আমরা নারীকে বলি দেবী, তাকে সমকক্ষ মানুষ বলে' ভাবতে পারিনে। অবশ্য নারীকে আমরা সুচারু রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে, সব রকম বিপদ আপদের আঁচ থেকে রক্ষা করেই চলি, কিন্তু আগে খোঁড়া করে' রেখে তারপরে তাকে মাথায় করে' বহন করাতে দাক্ষিণ্য প্রকাশ পায় না। বিধাতার দেওয়া পা থেকে বঞ্চিত করে' কাঁধের ওপর স্থান দিয়ে ভাবতে পারি যে তাকে উচ্চপদ দিলুম, কিন্তু তুনিয়ার দরবারে সে পদচ্যুতই রয়ে' গেল। মাঝে থেকে আমাদের পা তুটোর বিপদ এই হোলো যে সে মনে করে স্থির ভাবে বহন করাই তার কাজ, চলা তার নয়।

আমরা মানুষকে দরিদ্র করে' রাখি এবং সেই দরিদ্রকে ডেকে বলি, তুমি নারায়ণ ; সেটা তাকে স্রেফ উপহাস ! তার দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা আমাদের নয়—সেটা বজায় রাখাই কায়েমী নারায়ণ সেবার অঙ্গ বলে' সম্ভবত। আমরা মুখে বলি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ ; কিন্তু বিশেষ এক শ্রেণীর মানুষের ছায়া মাড়ালেও আমাদের নাইতে হয়। তারা যে বামুনের তুল্যই মানুষ এ কথা আমরা ভাবতেই পারিনে। মানুষ মাত্রেই ব্রহ্ম,

সে কথা ঠিক ; কিন্তু তাই বলে' কি তারা বামুনের সমান ? ব্রাহ্মণ যেন ব্রহ্মেরো বড়ো।

এই ভাবে নারীর সঙ্গে পুরুষের, নিম্নস্তরের সঙ্গে উচ্চস্তরের, মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলার অর্থগত, সমাজগত ও ধর্ম্মগত হাজারো রকমের বাধা। অথচ চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সঙ্গ যদি সহজ না হয়, অবাধ না হয়, বিচিত্র না হয়, তবে আমাদের সম্পূর্ণতাই বা আসবে কোন পথে, সার্থকতাই বা পাবো কোন ফাঁকিতে ? মিলনের রহস্যই যে পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো রহস্য, দেবার ও পাবার ঐ একটি মাত্রই যে প্রণালী।

এ যুগের সব চেয়ে বড়ো সমস্যা মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথ মুক্ত করা, প্রশস্ত করা ; সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করচে এরই ওপর। রাষ্ট্রনীতিক দিক দিয়ে, অর্থনীতিক দিক দিয়ে, সামাজিক দিক দিয়ে—নানা আদর্শ ও নানা ভাব থেকে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টাই আজকের মানুষের। এই জন্য যে কারণে অর্থনীতিক ক্ষেত্রে আমরা চাই সকলের ধনসাম্য, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সকলের সমান অধিকার, সেই কারণেই সামাজিক ক্ষেত্রে চাই সকলের একীকরণ।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন যাতে স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়, আমাদের সকল চেষ্টার মূলে এই প্রেরণা।

কিন্তু সূত্রের দর বাড়িয়ে সবাইকে সূত্রধর বানিয়ে দিলেই এই একীকরণ সম্ভব হবে না, কেননা সাম্যের প্রতীক ব্রাহ্মণ নয়, সে হচ্চে ভেদের মূর্ত্তি। সবাইকে শূদ্রত্বের মর্য্যাদা দিয়ে, বরং সেটা সম্ভব। ব্রাহ্মণের অতীত কলঙ্কিত এবং ভবিষ্যৎ শূন্যাকার—তার প্রাণশক্তি নিঃশেষিত, তার আদর্শের ক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ যে সেখানে কেবল তাদেরই ধরে, ধরিত্রীর সমস্ত মানুষের ঢোকার পথ সেখানে নেই। এই ভারতের স্রষ্টা শূদ্র, এর আদিম অধিবাসী শূদ্র, এর সভ্যতা শূদ্র-সভ্যতা। ব্রাহ্মণের দিন ফুরিয়ে এসেচে, বামুনের আগেও এই ভারতে শূদ্র ছিল, এবং শূদ্রই পরে থাকবে; কেননা এর প্রাণশক্তি প্রচুর, এর সম্ভাবনা অনন্ত। ব্রাহ্মণ হিন্দু সমাজের মাথা নয়, তার টিকি মাত্র; —এই পৌরাণিক তুশ্চিহ্ন লোপ পেলে তার একমাত্র এই ক্ষতি হবে যে তাকে অত্যন্ত আধুনিক দেখাবে।

কেউ হয়ত ভেবেই আকুল হবেন, বামুন যদি

গ্যালো তবে ব্রহ্মচর্চ্চা করবে কে! একদল লোক ব্রহ্মসেবা, আরেক দল শক্তিসেবা, এবং তৃতীয় দল পদসেবা করবে তবেই না হবে আদর্শ সমাজ! কিন্তু হায়, আজকের মানুষ যে সম্পূর্ণ হ'তে চায়,—ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, বৈশ্যের ঐশ্বর্য্য, শূদ্রের শ্রম—সবাতেই সে চায় সমান অধিকার;—ভাগাভাগি হিসেবে আধখানা মানুষ হ'য়ে তার সুখ নেই। মনুষ্যত্বের পূর্ণতার জন্য যদি ব্রহ্মচর্চ্চার প্রয়োজন থাকে তাহলে সে প্রয়োজন প্রত্যেক মানুষের,—কোনো বিশেষ শ্রেণীর ওপর তার বরাত দেওয়া চলে না। দিলে যা হয় তা ব্রহ্ম-চর্চ্চা নয়, ব্রহ্ম-চর্চ্চড়ি—কেননা এই বস্তুই একজন পাকিয়ে সকলের পাতে পরিবেশন করতে পারে।

কেবল বিভিন্ন জাতির সভ্যতা আত্মসাৎ করে'ই হিন্দু-সভ্যতা বিরাট হয়নি, বিভিন্ন জাতির রক্তের সঙ্গেও এর মিশ্রণ ঘটেচে। অনার্য্য, শক, হুন, দ্রাবিড়ের সঙ্গে যথেষ্ট আর্য্য-রক্ত মিলিত হ'য়ে হিন্দুর দেহ গড়েচে। বৌদ্ধ যুগে এবং কৌলীন্য প্রথার ফলে, বামুনের সঙ্গেও এই শূদ্র-রক্তের সাধু সংমিশ্রণ ঘটেছিল। অদূর ভবিষ্যতে মুসলমান ও খৃষ্টানকে আত্মসাৎ করে' এই শূদ্র-

সভ্যতা আরো মহত্তর হবে। মিলনের
মিশ্রণের পথেই এ আপনাকে পেয়েচে,
পথেই এ আপনাকে সম্পূর্ণ করবে। অচলা
ভেঙ্গে মুক্তি-পথ রচনার দায়ীত্ব তার। ভার
সভ্যতা বিপ্রবর্ণ নয়, শূদ্রবর্ণ ; ভারতের ভবি
তাই।